মহিবুল আলম

স্বাতি নক্ষত্রের জল

উপন্যাস

হাসপাতালে এসে এমন একটা দুঃসংবাদ শুনবে, রাকিব ও নদী মোটেও আশা করেনি। প্রফেসর ড. নিকোলাস রজারসনকে কিছুক্ষণ আগেই সিসিইউতে নিয়ে গেছে। তাঁর নাকি ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

অথচ প্রফেসর রজারসনের ড্রেন করে ফুসফুসের পানি বের করার পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। আগামী সপ্তাহেই তিনি হাসপাতাল থেকে রিলিজ হয়ে বাসায় ফিরে যেতেন। রাকিব ও নদী কত পরিকল্পনা করেছিল, প্রফেসর রজারসন বাসায় ফিরে গেলে তাঁকে মাঝে মধ্যে সময় দিবে। কাছে বা দূরে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাবে। ডেকে বসে অমাবস্যা দেখবে। জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোতে ভিজবে।

প্রফেসর রজারসনকে সিসিইউতে সেই যে ঢোকান হয়েছে, এখনো বের করার নাম নেই। এদিকে দুপুর প্রায় হয়ে এসেছে। অবশ্য সময়টাকে বলা যায়, সকাল ও দুপুরের সন্ধিক্ষণ। কিন্তু চারদিকে নিঃসীম ভাব। তারা যেখানটায় বসে আছে, সেটা সিসিইউর সামনের ছোট্ট একটা লাউঞ্জ। লাউঞ্জে সেন্ট্রাল হিটার চলছে বলে বেশ উষ্ণতা বোধ হচ্ছে। কিন্তু তাদের মনের অস্থিরতা কিছুতেই যাচ্ছে না।

রাকিব ঘড়ি দেখল। এখন পুরোপুরি বারোটা বাজে। লাউঞ্জের জানালার কাচ গলে একটুকরো ধার কাঁটা আলো ভেতরে এসে পড়েছে। ঘড়ির কাঁটাটা চলছে, টিক টিক, টিক টিক।

রাকিব দৃষ্টি ঘুরিয়ে নদীর দিকে তাকাল। নদীর উন্মুখ দৃষ্টি সিসিইউর দরজার দিকে। আহা বেচারী! প্রফেসর রজারসনকে সে পিতার মতো মান্য করে। নদী ওয়াইকাটো বিশ্ববিদ্যালয়ে নদী প্রথম ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে টিউশন ফি জমা দিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল, সে হ্যামিল্টনে কোনো একটা পার্ট টাইম চাকরি করে বাসস্থান ও আনুষঙ্গিক খরচ চালাবে। কিন্তু হ্যামিল্টনে এসে সে যেন সমুদ্রের পড়ে। অনেক জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করে কোথাও একটা পার্টটাইম চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। হ্যামিল্টনে একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের চাকরি পাওয়া মানে কোনো সোনার হরিণ হাতে পাওয়া।

বাংলাদেশে নদীর অবস্থা তেমন ভালো নয়। বাবা তো মারা গেছে তার জন্মের আগেই। শুধুমাত্র মা আছেন। যিনি একটা সরকারি কলেজে বাংলা সাহিত্য পড়ান। তিনি তিল তিল করে টাকা জমিয়ে নদীকে উচ্চশিক্ষার জন্য নিউজিল্যান্ডে পাঠিয়েছেন।

ঠিক এ অবস্থায় নদী হ্যামিল্টনে কী করবে ভেবে না পেয়ে যখন দিশেহারা, ঠিক তখনই প্রফেসর ড. নিকোলাস রজারসন সাহায্যের হাত বাড়ান। ওয়াইকাটো ইউনিভার্সিটিতে নদীর স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দেন। তারপর থেকেই তিনি নদীর মনে পিতার আসন গেড়ে বসে আছেন।

রাকিবের মনে অবশ্য প্রফেসর রজারসন এতটা প্রভাব ফেলতে পারেননি। যদিও শেষের দিকে প্রফেসর রজারসনের সঙ্গে রাকিবের একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই এ মুহূর্তে বারবার প্রফেসর রজারসনের চেহারাটা রাকিবের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। একজন বৃদ্ধের মুখ। হাসিখুসি ও প্রাণোচ্ছল। বেশ কৌতুকপ্রবণ। ভালো রহস্যও করতে জানেন।

প্রফেসর রজারসনের কথা ভাবতে ভাবতে রাকিব তার বাবার কথা ভাবল। তার বাবা মারা গেছেন কত বছর আগে। পনেরো বছর তো হবেই। রাকিব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানে অনার্সে দ্বিতীয় বছরে উঠেছে। একদিন বড় চাচা অফিস থেকে ফিরে বিকেলে তার বাবার মৃত্যু সংবাদটা দেন।

নদীর না হয় জীবনে বাবার প্রভাব কখনই ছিল না। নদী যখন তার মায়ের পেটে, তখন তার বাবা মারা যান। কিন্তু রাকিব?

রাকিব ভাবল, তার জীবনে কি কখনো তার বাবার প্রভাব ছিল? একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসা, একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া! সেই চার বছর বয়সে মা তাকে ফেলে চলে যান। তার বাবা এতই হাবাগোবা ছিলেন যে দিন-রাতের পার্থক্য বোঝার জন্য মানুষের যে একটা অতি ছোট্ট জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞানটা তার ছিল না।

রাকিবের মনে পড়ল, সে যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ত তখন তার বাবা লুঙ্গিটা অর্ধেক কাছা দিয়ে ও একটা শার্টের বোতাম অর্ধেক না লাগিয়ে শুধু শুধুই স্কুলে চলে আসতেন। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে ধরত। কেউ কেউ গান বাঁধত।-

ফরা কাজী, ফরা কাজী
নাকে হিঙ্গুল, দাঁতে ঘি
লুল পড়ে, ই-হিঁ, ই-হিঁ
ফরা কাজী, ফরা কাজী।

রাকিবের বাবার নাম ছিল কাজী ফরিদ উদ্দিন। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাকে ফরা কাজী বা বেপতার কাজী হিসাবে ডাকত। সেই ছোট বয়সেই রাকিব তার বাবাকে নিয়ে কী বিব্রতকর পরিস্থিতিতেই না পড়েছে। এ সব বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে সে নিজে নিজে কত যে কেঁদেছে! রাকিব তার বাবাকে স্কুলে আসতে দেখলেই স্কুলের পেছনের সারি সারি আমগাছের আড়ালে লুকিয়ে যেত।

হাইস্কুলে ওঠার পর রাকিবের এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতি আরও বেড়ে যায়। তার বাবা শুধু শুধুই স্কুলের টিচার্স রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কাজী বাড়ির মানুষ বলে কখনো কোনো শিক্ষক যদি তার বাবাকে চা-বিস্কুট খাওয়ার কথা বলতেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে বসে যেতেন। তারপর দেখা যেত তিনি প্রায় প্রতিদিনই সেই শিক্ষকের সামনে শুধু শুধুই হাসতেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন। শিক্ষকরা হয়তো একদিন-দুদিন চা-বিস্কুটের কথা বলতেন। কিন্তু পরে আর বলতেন না। কোনো কোনো শিক্ষক তার বাবার সঙ্গে কুৎসিত ভঙ্গি করে ঠাট্টা করতেন। স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা রাকিবের কাছে গিয়ে এসব ব্যাপারগুলো আরও রস লাগিয়ে বলত, এই রাকিব, তোর বাবা এসেছে যে। দেখ গিয়ে, টিচার্স রুমের সামনে কেমন হা করে তাকিয়ে আছেন। যা না, তোর বাবার কাছে যা। হে হে হে হে...!

রাকিব তার বাবাকে ভালোবাসত। অনেক ভালোবাসত। কেউ তার বাবাকে কিছু বললে সে হয়তো প্রতিবাদ করতে পারত না ঠিকই, কিন্তু নীরবে কাঁদত। মাঝে মধ্যে সেই বয়সেই সে বাবাকে গিয়ে ধমকাত, তিনি যেন স্কুলে না আসেন...।

বাবা কখনো শুনতেন, কখনো শুনতেন না।

একদিন হঠাৎ করেই তার বাবা স্কুলে আসা বন্ধ করে দেন। রাকিব স্বস্তি পায়। কিন্তু পরে সে জানতে পারে, তার বাবা হিরণের মায়ের বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকেন। হিরণের মা বিধবা ছিল। বাড়িতে সে একাই থাকত। তার একমাত্র ছেলে হিরণ ঢাকায় কারও বাসায় কাজ করত।

প্রথম প্রথম তার বাবা ও হিরণের মায়ের ব্যাপারটা নিয়ে গ্রামের কেউ মাথা ঘামাত না। তার বাবা তো এমনই। যেখানে সেখানে যান। কারও বাড়িতে গিয়ে সারাদিন এমনিই বসে থাকেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই ব্যাপারটা আর সাধারণ থাকে না। সবার মুখে মুখে ফিরতে শুরু করে। বছর ঘুরতেই শোনা যায়, হিরণের মা পোয়াতি।

এদিকে রাকিবের বাবা বাড়িতে জেদ ধরেন, তিনি হিরণের মাকে বিয়ে করবেন। হিরণের মায়ের পেটের বাচ্চাটা তার। গ্রামেও তিনি ঘরে ঘরে মানুষকে একথা বলে বেড়াতে শুরু করেন।

এ কথা শুনে একদিন বড় চাচা ব্যাপারটা সামলানোর জন্য ঢাকা থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বাড়িতে চলে আসেন। বড় চাচা তখন অতিরিক্ত সচিব। এমপি-মন্ত্রীদের সঙ্গে তার ওঠা-বসা। গ্রামে এলে মানুষ লাইন ধরে চাকরির জন্য। এ অবস্থায় তার ভাইয়ের এমন একটা কেলেঙ্কারি...! রাকিবের স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত। একদিন স্কুল থেকে এসে সে দেখে, তার বড় চাচা বাড়িতে তার বাবাকে মোটা রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে কোমরের বেল্ট দিয়ে পেটাচ্ছেন। তার বাবার সে কী কান্না! তখন দুপুর-বিকেলের সন্ধিক্ষণ ছিল। তার বাবাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল পশ্চিমের আম বাগানের একটা আম গাছের সঙ্গে। কোমরের বেল্ট দিয়ে পিটানোর পর তার বাবার মুখ থেকে অনবরত লালা ঝরছিল। রাকিবের দূর থেকে এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। বড় চাচার ওপর কথা বলার মানুষ শুধু তাদের বাড়িতে নয়, দুই-চার গ্রামে ছিল না।

তারপর তার বাবার আর কিছুই হয়নি। হাবাগোবা মানুষ। একবার বউ হারানোর কান্নায় অনেক দিন কেঁদেছিলেন। পরে হিরণের মাকে ভালোবেসে গোমতীর পাড়ে গিয়ে আরও অনেক দিন কেঁদেছেন।

কিন্তু হিরণের মা আর গ্রামে থাকতে পারেনি। বড় চাচা তাকে কাজ দেওয়ার নাম করে ঢাকায় নিয়ে কোথায় কাজ দিয়েছিলেন, তা গ্রামের মানুষ থাক দূরের কথা কাজী বাড়ির কেউ জানতে পারেনি। পরে হিরণের মা আর কোনোদিন গ্রামে ফিরে আসেনি। হিরণের মার এক টুকরো সম্পত্তি পরে বড় চাচার নামে হয়ে যায়।

বাবার মৃত্যুতে রাকিব যে খুব একটা কেঁদেছিল, তা নয়। ভালোবাসা ছিল। কষ্ট ছিল। ভেতরগত ভালোবাসা ও অন্তরগত কষ্ট। কিন্তু তবুও রাকিব বাবার মৃত্যুতে কাঁদেনি।

রাকিব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। দৃষ্টিটা ওঠানামা করল। অযথাই ছোট্ট লাউঞ্জটার এপাশ-ওপাশ দেখল। কিছুক্ষণ আগের ছোট্ট রোদের ফালিটা এখন আর নেই। বাইরের রোদটাও কেমন মিইয়ে এসেছে। ঘড়ির কাঁটা চলছে- টিক টিক, টিক টিক।

নদীর তখনো সিসিইউর দরজার দিকে উন্মুখ দৃষ্টি।

ঠিক তখনই সিসিইউর দরজা ঠেলে দুজন ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

নদী লাফিয়ে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হাউ ইজ মিস্টার রজারসন?

একজন ডাক্তার নির্জীব গলায় বললেন, হি ইজ নো মোর...!

দুই

শীতের সন্ধ্যায় সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অন্ধকার নেমে আসে। যদিও নিউজিল্যান্ডে সন্ধ্যা বা রাতের অন্ধকার বলতে বাড়ির পেছনের উঠোনের সামান্য অন্ধকার। সাধারণত নিউজিল্যান্ডে বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে বিদ্যুৎ যাওয়ার কোনো নজির নেই। তাই শহরের বাইরে না গেলে সন্ধ্যা ও রাতের যথার্থ অন্ধকার চোখে পড়ে না।

শীতের সন্ধ্যার অন্ধকার এরই মধ্যে বাসার পেছনের উঠোনে জমা হয়েছে। বাসার পেছনে একটা বড় কমলা গাছ। আর আছে একটা ফিজিওয়া গাছ। সেখান থেকে অনবরত ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে, ঝিঁ-ই-ই-ঝিরিৎ, ঝিরিৎ, ঝিঁ-ই-ই-ঝিরিৎ, ঝিরিৎ।

বাইরে শীত পড়েছে বেশ। স্থানে স্থানে ধোঁয়া ওঠার মতো কুয়াশা উড়ছে। জাহিদের শীতকাল ভালো লাগে না। অথচ এই শীতকালেই কিউই ফলের অরচার্ডের সবচেয়ে কঠিন কাজটা তাদের করতে হয়। খুব সকালে উঠে ঘাসের ওপর বিছিয়ে থাকা বরফের স্তর মচ মচ করে ভেঙে সবাই কিউই ফলের গাছের প্রুনিং করে। শীতকালের কিউই ফল গাছের এই প্রুনিংকে বলা হয় উইন্টার প্রুনিং।

কিউই ফল গাছের এই উইন্টার প্রুনিং জাহিদের কাছে খুব কঠিন কাজ মনে হয়। জাহিদ নিউজিল্যান্ডে প্রায় ছয় বছর ধরে বসবাস করছে। এর

আগে সে কখনো উইন্টার প্রুনিং করেনি। নিউজিল্যান্ডে আসার পর পর সে যখন কিছুদিন পাপামোয়া ছিল, তখন টিপুকিতে কিছুদিন কিউই ফলের পিকিং ও একটা প্যাকিং হাউজেও কাজ করেছিল। তারপর তো সে হেস্টিংস পাড়ি জমায়। কিছুদিন আগেই সে তাওরাঙ্গা শহরে এসে আবার বসবাস শুরু করেছে। এবারই সে প্রথম উইন্টার প্রুনিং করছে।

হকস বে অঞ্চলের আপেল অরচার্ডের সব কাজ জাহিদের নখদর্পণে ছিল। সেই কাজগুলো কঠিন হলেও কিউই ফলের কাজের মতো এত কঠিন নয়। কিন্তু হকস বে অঞ্চল ছেড়ে তাওরাঙ্গা শহরে আসতে হয়েছে শুধুমাত্র আজমল হোসেনের জন্য। আজমল হোসেনের নিউজিল্যান্ডে বৈধভাবে বসবাসের সব মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তিনি এখন লুকিয়ে লুকিয়ে অবৈধভাবে তাওরাঙ্গা শহরের বাঙালি কনট্রাকটারদের মাধ্যমে কিউই ফলের বাগানে কাজ করছেন। জাহিদকেও তাই বাধ্য হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এ ছাড়া উপায় কী? সে না থাকলে আজমল হোসেন যাবেন কোথায়?

এ ছাড়া অবশ্য লিডিয়ার ব্যাপারটাও ছিল। সব ঝামেলা শেষ করার পরও জাহিদের কাগজের বউ লিডিয়া অযথাই ফোন করে তার কাছে টাকা চাইত। এটা-সেটা বলে রাগারাগি করত। কখনো আগের মতো হুমকি দিয়ে বসত। যদিও লিডিয়া এখন তার কিছুই করতে পারবে না। জাহিদের নিউজিল্যান্ডের পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি হয়ে গেছে। আর তাদের সেপারেশন হয়ে গেছে কয়েক মাস আগেই।

জাহিদ বাসার পেছনের জমে থাকা অন্ধকার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আজমল হোসেনকে দেখার চেষ্টা করল। তিনি নিশ্চয়ই বেডরুমের একপাশে বসে শেকসপিয়ারের সমগ্রের বাংলা অনুবাদ পড়ছেন? এই বইটা যে তিনি কতবার পড়েছেন! তিনি বলেন, এসব বই পড়লে নাকি জ্ঞান হয়। কিন্তু জাহিদ বুঝতে পারছে না, একই বই এতবার পড়ার মধ্যে কী জ্ঞান হয়? জাহিদ আবার বাইরে তাকাল। অন্ধকারটা ঠিক জমাট নয়। বাসার ভেতরের আলো জানালা গলে বাইরে গিয়ে পড়েছে। দুটি বর্গাকার আলো। ঠিক বর্গাকার নয়, খানিকটা কৌণিক বর্গাকার। তার বাসায় দুটোই জানালা। একটা লাউঞ্জে, অন্যটা বেডরুমে।

জাহিদদের তাওরাঙ্গার বাসাটা ঠিক পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসা বলা যায় না। এটা বাসার পেছনে একটা স্লিপ আউট। অনেকে যেটাকে গ্র্যানি ফ্ল্যাট বলে। মূলত এটা বাড়ির পেছনে বাড়ি। যাদের বড় পরিবার, তারা ওটাকে শখের ফ্ল্যাট হিসেবে ব্যবহার করে। আর যাদের পরিবার ছোট, তারা ওটাকে ভাড়া দিয়ে বাড়তি কিছু পয়সা ব্যাংকে জমা করে।

জাহিদ ও আজমল হোসেন এই স্লিপ আউটটা হেদায়েত হোসেনের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে। হেদায়েত হোসেনের চার বেডরুমের বাসার পেছনের উঠোনে করোগেটেড আয়রন ও ওয়েদার বোর্ডের তৈরি এই স্লিপ আউটটা। একটা বেডরুম। বেডরুম লাগোয়া বাথরুম। ছোট্ট একটা লাউঞ্জ। লাউঞ্জের একপাশে কিচেন। বাইরে যাওয়ার একটাই মাত্র দরজা।

হেস্টিংস শহরে জাহিদদের যে বাসা ছিল, ওটা ছিল যথার্থ অর্থে স্বয়ং সম্পূর্ণ দুই বেডরুমের বাসা। দীর্ঘ একটা লাউঞ্জ ছিল। কিচেনটা অনেক বড় ছিল। হঠাৎ করে তাওরাঙ্গা শহরে এসে এই স্লিপ আউটে বসবাস করতে গিয়ে জাহিদের বেশ সমস্যার মধ্যেই পড়তে হয়েছে। আজমল হোসেনের সঙ্গে তার একই বেডরুমে থাকতে হচ্ছে। প্রাইভেসি বলতে কিছু নেই। প্রাইভেসির ব্যাপারটা কোনো সমস্যা না। সমস্যা যেটা হয়েছে, আজমল হোসেন খুব নাক ডাকেন। এত জোরে জোরে নাক ডাকেন যে একই রুমে তার পাশের বেডে ঘুমানো দায় হয়ে যায়। এমনিতে রাতে ঘুম না হলে ভোরে উঠে কিউই ফলের বাগানে পায়ের নিচে বরফের স্তর কড়মড় করে ভেঙে উইন্টার প্রুনিং করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

এ বাসায় ওঠার পর জাহিদ কিছুদিন বেডরুমে ঘুমালেও এখন আর সে সেখানে ঘুমায় না। সে লাউঞ্জের লম্বা সোফাটাতে ঘুমায়। টিভি দেখতে দেখতে সে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে।

জাহিদ জমে থাকা অন্ধকার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এবার হেদায়েত হোসেনের বাসার দিকে তাকাল। হেদায়েত হোসেন মানুষটা খারাপ নন, ভালোই। একটু চুপচাপ ধরনের। বয়স বেশি নয়, চল্লিশ বছরের মতো। নিউজিল্যান্ডে আছেন প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে। তাওরাঙ্গা-টিপুকি অঞ্চলে তিনি আরও দশজন বাঙালি কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে একজন কন্ট্রাক্টর। এরই মধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাওরাঙ্গা শহরের এই বাড়িটা বাদেও আরও দুটো বাড়ি আছে। ঢাকা রামপুরায় প্লট কিনে আট তলা একটা বাড়ি বানিয়েছেন।

জাহিদ ও আজমল হোসেন হেদায়েত হোসেনের অধীনেই কাজ করে। তাওরাঙ্গা-টিপুকি শহরের কিউই ফলের বাগানের কন্ট্রাক্টররা অনেকটা হকস বে অঞ্চলের আপেল অরচার্ডের কন্ট্রাক্টরদের মতোই। অরচার্ডের মালিকের কাছ থেকে কিউই ফলের বড় বড় বাগান নিয়েই তারা কমিশনে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করায়। তবে আপেল অরচার্ডে কাজ করার চেয়ে কিউই ফলের অরচার্ডের কাজে পয়সা বেশি। কিন্তু কাজটা খুব কঠিন। আপাতত জাহিদের কাছে তাই মনে হয়। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখছে, আজমল হোসেন এ কাজটা আপেল বাগানের কাজের চেয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে করছেন।

আজমল হোসেন কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, জাহিদ তা খেয়াল করেনি। সে খানিকটা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনি, ঘুমাননি?

আজমল হোসেন বললেন, না, বইটা পড়ছিলাম।

- কোন বইটা, শেকসপিয়ারের বাংলা অনুবাদ?
- আছে তো একটা বই। আর কোনটা পড়ব?
- তাওরাঙ্গা সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে ইংরেজি বই এনেও তো পড়তে পারেন?
- এমনিতে ইংরেজি পত্রিকা পড়তে খারাপ লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের বই ইংরেজিতে পড়তে তেমন আনন্দ পাই না। অনুবাদ করা থাকলে আনন্দ পাই। আর শেক্সপিয়ারের বাংলা অনুবাদ সমগ্রটা কত বড়! যতবার পড়ি ততবারই মনে হয় নতুন করে পড়ছি।

জাহিদ মৃদু হেসে বলল, তাই! ভালো।

আজমল হোসেনও সায় দিয়ে হাসলেন। এক মুহূর্ত চুপ থেকে কী ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী মন খারাপ?

জাহিদ বলল, নাহ, নাতো। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন স্যার?

- না মানে, তুমি এভাবে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছ?
- এমনিই স্যার।
- এমনিই কেউ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে না। আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?
- জি স্যার, করুন।
- তোমার কি কিউই প্রুটের কাজটা ভালো লাগছে না?

জাহিদ একটু চুপ থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, জি স্যার। আসলেই ভালো লাগছে না। কিউই ফ্রুট অরচার্ডের কাজটা আমি ঠিক পছন্দ করছি না। প্রায় পাঁচ-সাড়ে পাঁচ বছর আপেল অরচার্ডে কাজ করেছি তো, তাই ওই কাজটা আমার নখদর্পণে ছিল। কিউই ফ্রুটের কাজটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হচ্ছে।

আজমল হোসেন বললেন, আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে না। বরং আপেল বাগানের কাজটা আমার কাছে কঠিন মনে হতো।

- কয়েক দিন ধরে তাই তো দেখছি। সত্যি বলতে স্যার, আপনাকে অনেক আগেই আমার তাওরাঙ্গা-টিপুকিতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।
- এখানে এলে আমাকে আশ্রয় দিত কে?
- আশ্রয় মানে?
- এই যে, তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ?
- ছি, কী বলেন স্যার?
- এই আশ্রয় শব্দটা নেগেটিভ অর্থে নিচ্ছ কেন?
- কীভাবে নেব স্যার?
- পজেটিভ অর্থে নিবে। আচ্ছা, আশ্রয় শব্দটা বাদ দাও। তুমি আমাকে উপকার তো করছ। তুমি আছ বলেই এত দিন নিউজিল্যান্ডে আছি। নয়তো আমার কী যে হয়ে যেত! প্রায় ছয়টা বছর ধরে তুমি আমাকে আগলে রেখেছ! আজ আমার জন্য তোমাকে হেস্টিংস ছেড়ে তাওরাঙ্গা আসতে হলো।
- হেস্টিংস আমি এমনই ছেড়ে দিতাম স্যার। অন্তত লিডিয়ার জন্য।
- লিডিয়ার জন্য কেন?
- দেখলেন না, তাওরাঙ্গা আসার আগে দিয়ে কী ঝামেলাটা বাঁধাল? আমার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি হয়ে গেছে কয়েক মাস হয়ে গেছে। লিডিয়ার সঙ্গে টাকাপয়সার ঝামেলা বহু আগেই শেষ। কিন্তু তারপরও সে টাকাপয়সা চেয়ে কীভাবে হুমকি দিতে শুরু করেছিল?

- হ্যাঁ, মেয়েটা বেশ লোভী।
- শুধু লোভী নয় স্যার, মহালোভী। সে ভেবেছে, সারাজীবনই সে আমার কাছ থেকে হুমকি-ধমকি দিয়ে টাকাপয়সা আদায় করে নিবে। রেসিডেন্সি হওয়ার আগে অন্য ব্যাপার ছিল। তার সবকিছু মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন কেন?

তিন

বিকেলের রোদে দুজনের ছায়া দিঘল আকৃতি ধারণ করেছে। রাকিব আর নদী পার্কের ঘাস মাড়িয়ে পাশাপাশি সমান্তরালে হাঁটছে। রোদটা বেশ নরম। যদিও তির্যক রোদটা সরাসরি তাদের চোখে এসে পড়েছে, কিন্তু তাদের চোখ জ্বালা করছে না।

রাকিব জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে শার্ট-সুয়েটার ও একটা ভারী লেদারের জ্যাকেট পড়েছে। নদীর পরনেও জিন্সের প্যান্ট। নদী জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে ফতুয়া, ফতুয়ার ওপর লম্বা ও ভারী ওভারকোট পরেছে। ওভারকোটটা ছাই রঙের। শীতটা এ সপ্তাহে বেশ জেঁকে পড়েছে। দক্ষিণ দ্বীপের বেশিরভাগ শহরে বেশ তুষারপাত হয়েছে। কোথাও কোথাও বরফ জমেছে প্রায় মিটার উঁচু। উত্তর দ্বীপের কোনো কোনো শহরে ত্রিশ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে তুষারপাত হয়েছে। স্থানে স্থানে পুরু স্তরে বরফ জমেছে।

নদী দাঁড়িয়ে আছে প্রফেসর ড. নিকোলাস রজারসনের বাড়িটার দিকে মুখ করে। নদী যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ঠিক ফুটপাত নয়। অপ্রশস্ত একটা পার্ক। পার্কটার নাম ডেলিকার পার্ক। ডেলিকার পার্কের ঘাস মাড়িয়ে তার দৃষ্টিটা পুরোপুরি স্থির। রাকিবও তার পাশে। তবে রাকিবের দৃষ্টিটা তার মতো স্থির নয়।

রাকিব থেমে থেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তার দৃষ্টি কখনো নদীর ওপর স্থির হচ্ছে, কখনো পার্কে। কখনো বা পার্কের পাশের ওয়াইকাটো নদী, স্টেট হাইওয়ে ওয়ানের বাইপাস কনহ্যাম ড্রাইভ ও তার পাশের গাছগাছালিতে গিয়ে থামছে।

নদী বলল, দেখছেন, কীভাবে দুই সপ্তাহ চলে গেল?

রাকিব বলল, হ্যাঁ, সময় বড় অদ্ভুত!

- সবকিছু আগের মতোই আছে। কিন্তু...!
- কিন্তু মানুষটা নেই, তাই তো?
- জি রাকিব ভাই। শুধু সময় নয়, সবকিছুই কেমন অদ্ভুত!

রাকিব মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, গ্রামের একটা কথা আছে, আজ মরলে কাল দুই দিন। আমার দাদি এ কথাটা খুব করে বলতেন।

নদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে প্রফেসর রজারসনের বাড়িটার দিকে আবার পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকাল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। আজকে মরলে কালকে সত্যিই দুই দিন।

আজ শনিবার। দুই সপ্তাহ আগে এমনই এক শনিবারে প্রফেসর রজারসন মারা যান। তিনি মারা যান ঠিক দুপুরে।

প্রফেসর রজারসনের আত্মীয়স্বজনরা তাঁর মারা যাওয়ার পরদিন থেকেই আসতে শুরু করে। কেউ আসে তাওরাঙা শহর থেকে। কেউ আসে অকল্যান্ড থেকে। এ ছাড়া ওয়াইকাটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-শিক্ষক আসে। হ্যামিল্টনের বেশ কিছু বিশিষ্টজনও নিউস্টিড সিমেট্রিতে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে আসেন।

অকল্যান্ডের মানোকাউতে প্রফেসর রজারসনের যে ছেলে থাকে, সেই শুধু এসেছিল। প্রফেসর রজারসনের আর কোনো ছেলেমেয়ে তাঁকে দাফন করতে আসেনি। যদিও তারা দূরে দূরে থাকে। রাকিব ভাবল, এ এক আজব জীবন এখানকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। তাদের সবকিছু থেকেও নেই। সবকিছু পেয়েও তারা কিছুই পান না। মৃত্যুর পর তাদের একজন কান্নার মানুষ থাকে না।

নদী সেদিন খুব কেঁদেছিল। হাসপাতাল থেকে বাসা। পরদিন বিকেলে নিউস্টিড সিমেট্রির হলরুমে। নিউ স্টিড সিমেট্রির হলরুমে নদী প্রফেসর রজারসনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বারবার ঢুকরে কেঁদে উঠেছিল।

প্রফেসর রজারসন তাঁর বাড়িটা মারা যাবার বেশ আগেই উইল করে ট্রাস্টকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী তার ছেলেমেয়েদের কেউ এই বাড়ি থেকে একটা কানাকড়িও পাবে না। অবশ্য তাঁর ছেলেমেয়েরা যে সেই আশায় বসেছিল, তা-ও নয়। নিউজিল্যান্ডের জীবনযাত্রা এমনই। এখানে ছেলেমেয়েদের অনেকে বাবার সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি মনে করে না। বাবার ফার্মের বা অফিসে ছেলেমেয়েদের ঘণ্টা হিসাব করে

> শীতের সন্ধ্যায় সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অন্ধকার নেমে আসে। যদিও নিউজিল্যান্ডে সন্ধ্যা বা রাতের অন্ধকার বলতে বাড়ির পেছনের উঠোনের সামান্য অন্ধকার। সাধারণত নিউজিল্যান্ডে বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে বিদ্যুৎ যাওয়ার কোনো নজির নেই। তাই শহরের বাইরে না গেলে সন্ধ্যা ও রাতের যথার্থ অন্ধকার চোখে পড়ে না। শীতের সন্ধ্যার অন্ধকার এরই মধ্যে বাসার পেছনের উঠোনে জমা হয়েছে। বাসার পেছনে একটা বড় কমলা গাছ। আর আছে একটা ফিজিওয়া গাছ। সেখান থেকে অনবরত ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে, ঝিঁ-ই-ই-ঝিরিৎ, ঝিরিৎ, ঝিঁ-ই-ই-ঝিরিৎ, ঝিরিৎ

কাজ করতে হয়। অনেক ছেলেমেয়ে আঠারো পেরোতেই বাবা-মা অথবা সয়-সম্পত্তির দিকে ফিরেও তাকায় না। সেই বয়স থেকেই তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে।

বছর কয়েক আগে অকল্যান্ডে থাকাকালীন রাকিব নিউজিল্যান্ড হেরাল্ডে একটা মজার ঘটনা পড়েছিল। অকল্যান্ডের এক মিলিনিয়ার ভদ্রলোক তার কয়েক মিলিয়ন ডলারের বাড়ি ও সম্পত্তি মারা যাওয়ার আগে ছেলেমেয়েদের এক তোলা না দিয়ে তার প্রিয় কুকুরটার নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর সেই বাড়ি ও সম্পত্তি নিয়ে আইনগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। কুকুর তো এসব বৈষয়িক কোনো কিছু বোঝে না। কিন্তু তারপরও কুকুরটার হয়েছিল রাজকীয় হাল। কুকুরটা মিলিয়ন ডলারের বাড়ি ও সম্পত্তির মালিক! ল ইয়ারের পক্ষ থেকে তিনজন কর্মচারী রাখা হয়েছিল কুকুরটাকে শ্যাম্পু করিয়ে গোসল করানো, সকাল-বিকাল দাঁত ব্রাশ করানো, সময় সময় নখ কেটে দেওয়া, চিরুনী দিয়ে তিন-চার বেলা লোম আচড়ে দেওয়া ও সময়মতো টয়লেটে বা জগিংয়ে নিয়ে যাওয়া। নিউজিল্যান্ড হেরাল্ডে কুকুরটার ছবি যখন ছাপা হতো, তখন সেটার কী যে রাজকীয় ভঙ্গি থাকত...!

রাকিব বলল, নদী, চল আমরা হাঁটি।

নদী বলল, চলেন।

বিকেলটা প্রায় পড়ে এসেছে। শেষ বিকেলের নরম সোনালি রোদ ওয়াইকাটো নদীর দুই পাড়ের ঝুঁকে পড়া সারি সারি গাছগাছালিতে ল্যান্টে রয়েছে। তারা হাঁটতে হাঁটতে হায়াস প্যাডকের কাছে চলে এল।

রাকিব পাঁচটা ওক গাছের দিকে তাকাল। ওক গাছগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পাতাহীন ওক গাছগুলোর কেমন উদাস দৃষ্টি। কয়েকটা পাইন গাছ। নদীর ওপারে অসংখ্য গাছগাছালির মধ্যে একটা সাইপ্রাস গাছ

উন্মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। শেষ বিকেলের শীতের কুয়াশা হালকা হালকা ধোঁয়া হয়ে নদীর স্রোতের ওপর উড়ছে। স্রোতের বিপরীতে তিনটা হাঁস সাঁতার কাটছে। ঢেউয়ের বিপরীতে ঢেউ।
জেলিকো ড্রাইভ ও প্লাংকেট টেরেস ধরে কিছুক্ষণ পরপর গাড়ি আসা-যাওয়ার করছে। দুই-চারজন মানুষ এদিক-ওদিক ফুটপাত ধরে বৈকালিক হাঁটা হাঁটছে। পরিবেশটা এত নিস্তব্ধ নয়। তবুও রাকিবের কাছে পরিবেশটা বেশ নিস্তব্ধ লাগছে।
নদী জিজ্ঞেস করল, কোথা বসবেন?
রাকিব বলল, আমি বসব না। একটু ডকে গিয়ে দাঁড়াব। তুমি যাবে?
নদী বলল, আপনি যেখানে যাবেন আমি সেখানেই যাব।
- নরকে গেলেও?
- জি, নরকে গেলেও।
রাকিব মৃদু হেসে বলল, বেশ বেশ।
নদী বলল, তবে আমার একটা শর্ত আছে।
- কী শর্ত?
- আপনি ডকে দাঁড়িয়ে একটা কবিতা আবৃত্তি করবেন। নতুন যে কবিতাটা লিখেছেন।
রাকিব আবার মৃদু হেসে সায় দিল।
তারা ডকে এসে দাঁড়াল। নদীতে তখন জোয়ারের টান। নদীর স্রোত পাড়ের বড় বড় পাথরে ও ডকে এসে আছড়ে পড়ছে- ছলাৎ ছলাৎ, ছলাৎ ছলাৎ। গাছে গাছে অসংখ্য পাখি ডাকছে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে কাটতে হাঁসগুলো ডাকছে- প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক।
নদী জিজ্ঞেস করল, কই, কবিতা আবৃত্তি করছেন না কেন?
রাকিব বলল, এর আগে একটা কথা বলতে চাই।
- কী কথা?
- আসলে কথা নয়, তোমাকে কিছু দিতে চাই।
- কী দিতে চান?
- তোমাকে আমার গাড়িটা দিতে চাই।
- নতুন গাড়িটা?
রাকিব হেসে বলল, আমার নতুন গাড়িটা নিবে?
নদী বলল, না।
- কেন নিবে না?
- আমি এতবড় গাড়ি পছন্দ করি না, তাই। টয়োটা প্রাডো! আপনি পাগল হয়েছেন?
- পাগল নয়, সত্যি বলছি।
- দেখুন, আমার সঙ্গে এ ধরনের মজা করবেন না। আমি জানি, আপনি এ ধরনের পাগলামি করার মানুষ নন।
- তুমি ভুল জেনেছ।
নদী এবার একটু কঠিন হয়ে বলল, কী ভুল জেনেছি?
নদীকে কঠিন হয়ে যেতে দেখে রাকিব হেসে ফেলল।
নদী জিজ্ঞেস করল, হাসছেন কেন?
রাকিব মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, এমনিই। আচ্ছা, এবার মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমার আগের গাড়িটা আমি ট্রেড-ইন করিনি। তারা গাড়িটার দাম খুব কম বলছিল। মাত্র তিন হাজার ডলার। অথচ আমি এমনি কারও কাছে বিক্রি করতে গেলে ছয় হাজার ডলারের ওপরে পাব।
- তাহলে আপনার আগের গাড়িটা কোথায়? আমি তো আপনার বাসার সামনে নতুন গাড়িটা দেখেছি।
- আগের গাড়িটা আমাদের অফিসের কারপার্কে রেখেছি।
- গাড়িটা যদি প্রাইভেটে বিক্রি করতে চান তাহলে বিক্রি করে দেন। শুধু শুধু তিন হাজার ট্রেড-ইন করার দরকার কী? ছয় হাজার ডলার পাবেন, ওটা ভালো না?
- গাড়িটা আমি তোমাকে দিতে চাই।
- কী বললেন?
- তোমার একটা গাড়ির প্রয়োজন। আমি সেই গাড়িটা তোমার দেওয়ার জন্য রেখেছি।
নদী এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল। তারপর কী ভেবে আস্তে করে বলল, আমি আপনাকে অত টাকা দিব কোথায় থেকে?
রাকিব বলল, তোমাকে টাকা দিতে হবে কেন?
নদী জিজ্ঞেস করল, আমাকে দিতে হবে না কেন?
রাকিবও এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল। নদীর ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অযথাই পাড়ের ওক গাছগুলোকে দেখল। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা হাঁসগুলোর দিকেও সে একবার তাকাল। তারপর নদীর দিকে আবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, নদী, আমাদের কি এমন কোনো সম্পর্ক হয়নি যে তোমাকে একটা গাড়ি দিতে পারি?
নদী কিছু বলল না।
রাকিব বলল, আমি তো তোমাকে আমার নতুন গাড়িটা দিচ্ছি না।
নদী জিজ্ঞেস করল, কেন দিচ্ছেন না? গাড়ি দিলে নতুন গাড়িটা দিবেন।
- না, নতুনটা দিলে ওটা বাহুল্য মনে হবে।
- কেন বাহুল্য মনে হবে?
- সেটা তুমি ভালো করেই জানো।
- পুরোনো গাড়িটা দিলে কি বাহুল্য মনে হবে না?
- না, কারণ তোমার গাড়িটা প্রয়োজন। আমি তোমার প্রয়োজনটা দেখছি। আর তুমি তো একটা গাড়ি কিনবে বলেই পরিকল্পনা করেছিলে, তাই না?
নদী মাথা ঝাঁকাল। বেশ নরম দৃষ্টিতে রাকিবের দিকে তাকাল। রাকিবের দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, আমি কি আপনার হাতটা ধরতে পারি?
রাকিব নরম হেসে বলল, হ্যাঁ, ধর।
নদী হাত বাড়িয়েও কেন জানি রাকিবের হাতটা ধরল না। বলল, থাক, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।
- কী কথা?
- আপনি কি নতুন গাড়িটা কিনেছেন আমাকে আপনার আগের গাড়িটা দেওয়ার জন্য?
রাকিব একটু চুপ থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ!

চার

আজ সারাদিন খুব পরিশ্রম গেছে। কিউই ফলের বাগানটা ঠিক যেন বাগান ছিল না। জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। টিপুকির কাছে মাকিতুতে তাদের কাজ হয়েছিল। সাধারণত উইন্টার প্রুনিংয়ে একেকটা কিউই ফল গাছের দশ-এগারোটা নতুন ডালা ও দুই-তিনটা পুরোনো ডালা রেখে বাকি সব ডালা কেটে ফেলে দিতে হয়। কিন্তু মাকিতুর কিউই ফলের বাগানে যেন নতুন ডালা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, সব ডালা পেঁচিয়ে শুধু জঙ্গল নয়, দুর্বোধ্য জঞ্জালে পরিণত হয়েছে।
এত পরিশ্রমের পরও জাহিদকে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে রান্না করতে হয়েছে। আজমল হোসেন অবশ্য তাকে আগাগোড়া রান্নায় সহযোগিতা করেছেন। রাত আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে আজমল হোসেন বেডরুমে চলে যান। জাহিদ লেপ মুড়ি দিয়ে দিঘল সোফাটায় গা এলিয়ে টিভি দেখতে বসে। টিভি দেখতে দেখতে জাহিদ এক সময় সোফায় ঘুমিয়ে পড়ে। তাওরাঙ্গা আসার পর সে রাতে এমনটাই করছে। রাতের খাবার খেয়ে লাউঞ্জে লেপ মুড়ি দিয়ে টিভি দেখে। এক সময় টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। এমনও হয়, সে সকালে ঘুম থেকে উঠে টিভি বন্ধ করে।
আজও জাহিদ টিভি দেখতে দেখতে লাউঞ্জের সোফাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যে সে একটা স্বপ্নও দেখছিল। কিন্তু কী স্বপ্ন দেখছিল, তা জাহিদ ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই মনে করতে পারল না। ঘুম ভাঙার পর প্রথমে সে শুনল টিভির শব্দ। তারপর শুনল আজমল হোসেনের নাক ডাকার শব্দ। এর পরপরই সে স্লিপ আউটের দরজায় কাউকে কড়া নাড়তে শুনল। জাহিদ ঘড়ি দেখতে দেখতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লাউঞ্জের লাইটটা তখনো জ্বালানো। সে তৎক্ষণাৎ ঘড়ি দেখল, রাত এগারোটা বাজে।
জাহিদ জিজ্ঞেস করল, কে?
- আমি, দরজা খোল।
- আমি কে?
- আমি হেদায়েত।
জাহিদ দরজা খুলল। কিন্তু সে দরজা খুলেই হেদায়েত হোসেনের চেহারার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। হেদায়েত হোসেনের চেহারা একেবারেই বিধ্বস্ত। মনে হচ্ছে, এই মাত্র তিনি কোনো ব্যাপারে কান্নাকাটি করে এসেছেন। চোখ তখনো ভেজা। গালের ওপর চোখের জলের সরু রেখা।
জাহিদ জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে হেদায়েত ভাই? এত রাতে?
হেদায়েত হোসেন কান্না জড়ানো গলায় বললেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।
- কী সর্বনাশ?

- তোমার ভাবি জেদ ধরে অনেকগুলো প্রেশারের ওষুধ খেয়ে ফেলেছে।
- অনেকগুলো মানে?
- অনেকগুলো মানে ত্রিশ-চল্লিশটা। আরও বেশি হতে পারে।
- এটা কীভাবে হলো?
- তুমি তো জানোই, তোমার ভাবির ব্লাড প্রেশার হাই। সব সময় প্রেশারের ওষুধ খায়। আজ জেদ ধরে বাসায় যতগুলো প্রেশারের ওষুধ আছে, সব খেয়ে ফেলেছে।
- বলেন কী!
- হ্যাঁ, জাহিদ। আমি কী করব বুঝতে পারছি না।
- অ্যাম্বুলেন্স কল করেছেন?
- না, ঘটনাটা এইমাত্রই ঘটেছে। আমি দিশা না পেয়ে তোমার এখানে চলে এসেছি।

জাহিদ তার স্লিপিং গাউনটা চাপিয়ে বলল, চলেন, চলেন, আগে ভাবির অবস্থা দেখি। তারপর না হয় অ্যাম্বুলেন্স কল করব।

হেদায়েত হোসেন বললেন, তাই কর। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

হেদায়েত হোসেনের বাসায় ঢুকে জাহিদ দেখল, ঘটনাটা এইমাত্র ঘটলেও লাকি ভাবির অবস্থা খুবই খারাপ। লাকি ভাবির মুখ দিয়ে অনবরত দিয়ে সরু ফেনা বের হচ্ছে। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। হেদায়েত হোসেন ও লাকি ভাবির বারো বছরের ছেলে সজল চুপচাপ মার পাশে বসে আছে।

হেদায়েত হোসেন লাকি ভাবির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কেঁদে উঠে বললেন, জাহিদ, আমি এখন এই পাগলটাকে নিয়ে কী করব?

লাকি ভাবি বিড় বিড় করে বললেন, হেদায়েত, আমাকে বাঁচাও।

জাহিদ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বলতে পারল না। একটা দেয়াল ঘড়ি চলছে- টিক টিক, টিক টিক। বাইরে রাতের নিস্তব্ধতা। শীত কুয়াশার জল পড়ছে- টুপ টুপ, টুপ টুপ।

লাকি ভাবি আবার বিড় বিড় করে বললেন, ওগো, শুনছ, আমি মরে যাচ্ছি...!

হেদায়েত হোসেন এবার বাচ্চা ছেলের মতো ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন।

জাহিদ বলল, ভাবি, আপনার কিছু হবে না। আপনি ভালো হয়ে যাবেন। আমি অ্যাম্বুলেন্স কল করছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরেন। ঘাবড়াবেন না। বলেই সে হেদায়েত হোসেনের দিকে তাকিয়ে বলল, হেদায়েত ভাই, আপনি একটা তোয়ালে ভিজিয়ে ভাবির মুখটা মুছে দিন। আমি এখনই একটা অ্যাম্বুলেন্স কল করছি।

হেদায়েত হোসেন ওঠার আগেই সজল বলল, আমি তোয়ালে নিয়ে আসছি।

জাহিদ তৎক্ষণাৎ ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান এ ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অ্যাম্বুলেন্স এল ঠিক আধাঘণ্টা পর। এরই মধ্যে জাহিদ একবার ভেবেছিল, হেদায়েত হোসেনকে সঙ্গে করে সে নিজেই লাকি ভাবিকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাবে। কিন্তু পরক্ষণ তার মাথায় আসে, রাস্তায় যদি কিছু হয়ে যায়? তাই সে অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষায় থাকে।

অ্যাম্বুলেন্স এলে হেদায়েত হোসেন স্ট্রেচারের অপেক্ষা না করেই লাকি ভাবিকে পাঁজাকোলে করে অ্যাম্বুলেন্সের কাছে নিয়ে এল। সজল পেছনে পেছনে এল।

লাকি ভাবিকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলতেই জাহিদ হেদায়েত হোসেনকে বলল, হেদায়েত ভাই, আপনি আর সজল অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে হাসপাতালে চলে যান। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।

হেদায়েত হোসেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে সায় দিলেন।

অ্যাম্বুলেন্স সাঁই সাঁই করে চলে গেল।

জাহিদ তার স্লিপ আউটে ঢুকেই দেখল, আজমল হোসেন ঘুম থেকে উঠে সোফায় বসে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। টিভিটা তখনো চলছে।

জাহিদ জিজ্ঞেস করল, স্যার, আপনি ঘুম থেকে উঠে গেছেন যে?

আজমল হোসেন বললেন, হ্যাঁ। এখানে কে যেন এসেছিল। কথাবার্তা শুনলাম। তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেছে। লাউঞ্জে এসে দেখলাম, তুমি নেই।

- হেদায়েত ভাই এসেছিলেন।
- হেদায়েত এসেছিল কেন?
- লাকি ভাবি জেদ ধরে প্রেশারের অনেকগুলো ওষুধ খেয়ে ফেলেছেন।
- বলো কী! এখন কী অবস্থা?
- অ্যাম্বুলেন্স কল করে হেদায়েত ভাই লাকি ভাবিকে নিয়ে তাওরাঙ্গা হাসপাতালে গেছেন। সজলও গেছে। আমি এখন যাব। আপনি যাবেন?
- হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও যাব।
- তাহলে কাপড়চোপড় পরে তাড়াতাড়ি তৈরি হন। গরম কাপড় বেশি করে পরবেন। বাইরে অনেক শীত পড়েছে।

জাহিদ ও আজমল হোসেন স্লিপ আউট থেকে তৃরিত একটা প্যান্ট শার্ট পরে, তার ওপর ভারী সোয়াটার ও একটা ভারী জ্যাকেট চাপিয়ে, গলায় একটা মাফলার পেঁচিয়ে তাওরাঙ্গা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। রাত তখন প্রায় বারোটা বাজে। শীতের রাত। রাস্তা-ঘাট প্রায় ফাঁকা। তাওরাঙ্গা শহরটা সমুদ্রের তীরে বলে, এখানে অত কুয়াশা পড়ে না। কিন্তু আজ বেশ কুয়াশা পড়েছে। রাস্তার প্রতিটা বাতির সামনে কুয়াশার স্তরটা স্তব্ধ হয়ে জমে আছে। বাইরের তাপমাত্রা এখন নিশ্চয়ই হিমাঙ্কের নিচে। জাহিদ স্টেট হাইওয়ে টু ধরে যাচ্ছে। সেখান থেকে এলিজাবেথ স্টিটে মোড় নিয়ে দিঘল ক্যামেরুন রোড ধরে তাওরাঙ্গা হাসপাতালে যাবে।

রাস্তায় দুই-একটা গাড়ি আসা-যাওয়া করছে। দুই-একটা পুলিশের গাড়ি ধীরে-স্থিরে টহল দিচ্ছে। দুই-একটা সিকিউরিটি অফিসারের গাড়ি। মধ্যরাতের একটা প্লেন যাচ্ছে ওপরের কুয়াশা ভেদ করে। তাওরাঙ্গা পোর্টে বড় একটা জাহাজ ভিড়েছে।

জাহিদ গাড়ি চালাতে চালাতে গাড়ির গ্লাস গলে বাইরে তাকাল। তাওরাঙ্গা পোর্টের সারি সারি থেমে থাকা স্পিডবোটগুলো থেকে সারি সারি আলোর রেখা আসছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পিডবোটগুলোর আলোর রেখা ওঠানামা করছে। স্পিডবোটগুলোতে কোনো মানুষজন নেই। বহুতল বিশিষ্ট ক্রুজ শিপটার ছোট ছোট জানালা ভেদ করে ভেতরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বিন্দু বিন্দু হয়ে। জলের প্রতিবিম্বে আলোগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে উঠছে।

হাসপাতালে পৌঁছে ইমার্জেন্সিতে ঢুকতেই জাহিদ ও আজমল স্যার দেখল, এরই মধ্যে লাকি ভাবিকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সজল আইসিইউর ভেতরে। কিন্তু হেদায়েত হোসেন আইসিইউর সামনের ছোট্ট লাউঞ্জের একটা চেয়ারে অবলম্বনহীন বসে আছেন।

জাহিদকে দেখা মাত্রই হেদায়েত হোসেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। হেদায়েত হোসেনকে দেখে মনে হচ্ছে হাইপারটেনশন লাকি ভাবির নয়, হেদায়েত হোসেনের।

জাহিদ হেদায়েত হোসেনের পাশের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, এখন ভাবির কী অবস্থা?

হেদায়েত হোসেন শিশুর মতো কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তোমার ভাবির শরীরের টেম্পারেচার খুব তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড প্রেশারও নেমে যাচ্ছে।

- আপনি বাইরে বসে আছেন যে?
- আমার ভেতরের পরিবেশটা সহ্য হচ্ছিল না।
- ভাবি কথা বলতে পারছেন তো?
- হ্যাঁ, এখনো কথা বলছে।
- আপনি ভেতরে ঢোকেন। আপনাকে এখন ভাবির পাশে থাকতে হবে। অন্তত ভাবিকে মানসিকভাবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য।

হেদায়েত হোসেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জাহিদ তুমিও আমার সঙ্গে ভেতরে চল। আমারও মানসিকভাবে সাপোর্টের প্রয়োজন।

জাহিদ জিজ্ঞেস করল, একসঙ্গে এত মানুষ আইসিইউতে ঢুকতে দেবে?

হেদায়েত হোসেন বললেন, আজমল স্যার এখানে থাকুক। তুমি আমার সঙ্গে ভেতরে আস।

জাহিদ সায় দিয়ে হেদায়েত হোসেনকে অনুসরণ করল। জাহিদ বুঝতে পারছে না, একসঙ্গে অনেকগুলো প্রেশারের ওষুধ খেয়ে ফেললে বাঁচার জন্য কতটুকু হুমকিস্বরূপ।

আইসিইউতে ঢুকে হেদায়েত হোসেন কিছুতেই তার কান্না থামাতে পারছেন না। যদিও তিনি শব্দ করে কাঁদছেন না। কিন্তু কান্নাটা যেন তার ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উথলে উঠছে। সজল চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। লাকি ভাবির শরীরে পানিশূন্যতাও দেখা দিয়েছে। নার্স সেলাইন ঝুলিয়ে পানিশূন্যতা দূর করার চেষ্টা করছে।

এরই মধ্যে লাকি ভাবি হেদায়েত হোসেনের হাত টেনে বিড়বিড় করে

বললেন, আই লাভ ইউ। তুমি আমাকে বাঁচাও...!
হেদায়েত হোসেন এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।
ডাক্তার জাহিদকে বললেন, প্লিজ, আপনি ওনাকে বাইরে নিয়ে যান।
ব্যাপার ছিল অতি সাধারণ। হেদায়েত হোসেন ও লাকি ভাবির মধ্যে বাংলাদেশের তাদের সয়-সম্পত্তি নিয়ে কী সব কথা কাটাকাটি হয়েছিল। লাকি ভাবি খুব জেদি। এ ছাড়া তিনি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। এই বয়সেই তাকে নিয়মিত প্রেশারের ওষুধ খেতে হয়। তাই কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে লাকি ভাবি জেদের বশে হাতের কাছে পাওয়া প্রেশারের ওষুধগুলো একত্রে মুখে দিয়ে চাবিয়ে খেয়ে ফেলেন। হয়তো তিনি কাজটা জেদের বশে করেছেন। কিন্তু প্রেশারের ওষুধগুলো খাওয়ার পর তার টনক নড়ে। মনের ভেতর ভয় ঢুকে যায়। তার মধ্যে মৃত্যু চিন্তা এসে ভিড় করে।
অথচ তাদের দুজনের প্রেমের বিয়ে। বাংলাদেশে থাকতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিষয় নিয়ে মাস্টার্স করে হেদায়েত হোসেন একটা ওষুধ কোম্পানিতে বেশ ভালো বেতনেরই চাকরি পান। চাকরি পাওয়ার পরপরই লাকি ভাবিকে বিয়ে করেন। যদিও তাদের প্রেমের বিয়ে, লাকি ভাবি হেদায়েত হোসেনের দূর সম্পর্কের খালাত বোন হওয়াতে পারিবারিকভাবেই জাঁকজমকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের দুই বছরের মাথায় তারা অভিবাসী হয়ে নিউজিল্যান্ডে চলে আসেন। তাদের ছেলে সজলের জন্ম এই নিউজিল্যান্ডে।
হেদায়েত হোসেন ও লাকি ভাবির সংসারটা বলা যায় অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাটই ছিল। ষোল বছরের বিবাহিত জীবনে তাদের সম্পর্কের খুব একটা উত্থান-পতন হয়নি। নিয়মমাফিক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটু-আধটুকু ঝগড়াঝাঁটি হতেই পারে। জাহিদ তাদের বাসার পেছনের স্লিপ আউটে বসবাস করতে এসে গত দেড় মাস ধরে এর বেশিকিছু দেখেনি। কিন্তু আজ?
লাকি ভাবি পুরো চার ঘণ্টা আইসিইউতে থাকার পর ভোর পাঁচটার দিকে তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার আগে তিনি কোমায় চলে গিয়েছিলেন। ভেন্টিলেটার দিয়ে তাকে ঘণ্টাখানেক বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল।

পাঁচ

আজ অফিসে রাকিবের কাজের চাপ খুব বেশি ছিল। দুপুরের দিকে তার মনে হয়েছিল, আজ বুঝি সে সাড়ে ছয়টা বা সাতটার আগে অফিস থেকে বের হতে পারবে না। মাঝে মধ্যে তার এমনটা হয়। সাতটার দিকে সে অফিস ছেড়ে বাসায় ফেরে।
কিন্তু রাকিব সাড়ে চারটার সময় দেখল, হঠাৎ করেই কাজের চাপ কমে গেছে। ডেভিড ইটন তার মুখোমুখি কেবিন থেকে একটা স্বস্তির দিঘল হাসি দিল। একটু নিচু স্বরে বলল, যাক, বাঁচা গেল বাবা। আজ দুপুরের খাবারটাও ঠিক মতো খেতে পারিনি।
রাকিব আজ কাজের ব্যস্ততায় দুপুরের খাবারই খায়নি। অবশ্য সে সাড়ে দশটার সময় অফিসের পাশের বেকারি থেকে একটা চিকেন-অ্যাবাকাডো স্যান্ডউইচ খেয়েছিল।
তারা ঠিক পাঁচটার সময় অফিস থেকে বের হলো। অফিস থেকে বের হয়ে রাকিব সরাসরি ম্যাকডোনাল্ডসের ড্রাইভ থ্রোতে ঢুকল। একটা ম্যাক-চিকেন বার্গার, চিপস ও স্প্রাইটের কম্বো নিল। গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতেই সে একহাতে গাড়ির স্টেয়ারিং ধরে ড্রাইভ করে অন্যহাতে বার্গার, চিপস ও স্প্রাইট শেষ করল। সে সত্যিই খুব ক্ষুধার্ত ছিল।
বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। শীতের সন্ধ্যা। সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যা নেমে আসে।
রাকিব বাসায় ঢুকে প্যান্টশার্ট খুলে একটা থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে ভারী গাউনটা চাপিয়ে নিল। সে আপাতত একটা ব্ল্যাক কফি খাবে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সে ব্ল্যাক কফি খেতে খেতে শীতের সন্ধ্যার বিষণ্নতাকে অনুভব করবে।
রাকিব কফির কথা ভাবতে ভাবতেই কিচেনে গেল। হট ওয়াটার জগে পানি নিয়ে অন করে সে কফির কাপে পরিমাণ মতো ইনস্ট্যান্ট কফি নিল। সে আজ কফির সঙ্গে চিনি খাবে না। বিষণ্ন সন্ধ্যায় তিতা কফির স্বাদই আলাদা।
হট ওয়াটার জগে বুদ বুদ শব্দ তুলে পানি গরম হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হট ওয়াটার জগে পানির বলক উঠবে। তারপর শিস দিয়ে ধোঁয়া বের হবে। এ দৃশ্যটা খুব সাধারণ। রাকিব প্রতিনিয়তই এই দৃশ্যটা দেখে আসছে। কিন্তু তারপরও সে এখন এই দৃশ্যটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। সে কিচেনে এলে আরও একটা দৃশ্য দেখে। মাইক্রোওয়েভ অন করে খাবার গরম করার সময় ডিজিটাল মনিটরের সেকেন্ড কমতে থাকা সে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে।
মাইক্রোওয়েভ যখন অন করা হয়, তখন ওটার ডিজিটাল মনিটরে যে প্রতিটা সেকেন্ডের কমে আসে, ওটা সে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে।
হট ওয়াটার জগে শিস দিয়ে ধোঁয়া উঠতেই রাকিব কফির কাপে পানি ঢেলে চামচে নেড়ে সরাসরি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। কফির কাপে চুমুক দিতেই একধরনের প্রশান্তি এসে তার ভেতর ভিড় করল। সে দিঘল দৃষ্টি মেলে তাকাল। চারদিকে সন্ধ্যা নামলেও এখনো সন্ধ্যাটাকে ধূসর সন্ধ্যা বলা যায়। লনের পাশের পাতাহীন ওক গাছটায় তিনটা চড়ুই তখনো কিচিরমিচির শব্দ তুলে এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ছে। ম্যাকফার্লেন স্ট্রিটের দিঘল ফুটপাত ধরে তখনো একজোড়া বৃদ্ধ দম্পতি কলকল হাসি তুলে হাঁটছে। রাস্তার বাতিগুলো এরই মধ্যে জ্বলে উঠেছে। বাতিগুলোর সামনে সন্ধ্যার একধরনের কুয়াশা। শীতের হিন হিন বাতাস বইছে।
রাকিব কফির কাপে চুমুক দিয়ে একটা কবিতা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। সে জানে, প্রতিটা সন্ধ্যার একধরনের হাহাকার আছে। দিন শেষের হাহাকার। দিন শেষের হাহাকার অনেকটা জীবন শেষের হাহাকারের মতো।
এই সাদা মেঘ, মেঘে মেঘে সন্ধ্যায় দিঘল মেঘের ভেলা-
কোনো যুবতীর আঁচল বিছিয়ে দেওয়া ধূসর নীল শাড়ি
অচেনা বাতাসে শুধু তড়পায়, শুধু তড়পায়। যৌবনে যুবতী যায়।
এ যে এক শত বছরের জঞ্জালের মতো গোমতীর বুকে কোনো মহাজন নৌকা বায়।
বুবুরা তখন হাত ইশারায় হাঁস ডাকে- এই প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক, এই প্যাঁক প্যাঁক...!
রাকিব কফির কাপে চুমুক দিয়ে আধা শেষ হওয়া কফির কাপটা মধ্যমা আঙুলে ঝুলিয়ে আবার দিঘল দৃষ্টি মেলল। তার চারপাশের পরিবেশটা একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে আছে। সন্ধ্যাটা আরও গাঢ় হয়ে নেমেছে। চড়ুই পাখিগুলো কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। কাছেই কোথাও ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে- ঝিঁ-ই-ই, ঝিরিত, ঝিরিত, ঝিঁ-ই-ই। একটা রাত পাখি ডেকে গেল- কোয়েক-কোয়েক। একটা বিড়াল সামনের লন ধরে যেতে যেতে ডেকে উঠল- মিয়াও মিয়াও।
রাকিব একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলল। এমনিই। আতিক ক্লোডল্যান্ডে নতুন বাসায় বউ নিয়ে বেশ সুখের সংসার পেতেছে। এরই মধ্যে আতিক ট্যাক্সির শেয়ার কিনে এখন নিজের ট্যাক্সি চালাচ্ছে। নতুন পঞ্চান্ন ইঞ্চি এলইডি টিভি, নতুন ফ্রিজ, নতুন সোফাসেট আরও কত কী!
রাকিব একদিন অফিস শেষে আতিকের বাসায় গিয়েছিল। আতিক তাকে রাতের খাবার না খাইয়ে ছাড়েনি। আতিকের বউটাও বেশ মিশুক। শ্যামলার মধ্যে একেবারেই ছোটখাটো ধরনের মানুষ। তবে বেশ বুদ্ধিমতী বলে বোঝা গেছে।
আতিকের সুখ দেখে রাকিবের সেদিন বেশ ভালো লেগেছে। মনে মনে কিছুটা হিংসে যে হয়নি, তা নয়। সেই হিংসেটা নিজের অপূর্ণতা থেকে। আজকাল রাকিব নদীকে নিয়ে সত্যি খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। তার জীবনে নদী না এলে সে হয়তো তার মার কথায় বা ছোট ফুফুর কথায় বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে বউ নিয়ে আসার কথা ভাবত। আতিকের সুখের সংসার দেখে সে এতটুকু বুঝতে পারছে, আর যাই হোক একজন বাঙালি ছেলে একজন বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে জীবনের পূর্ণতা পেতে পারে। নিজের সংস্কৃতি বলে কথা। এটা শুধু বাঙালিদের ক্ষেত্রেই নয়। অন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
রাকিব জানে, ক্রস-কালচার বলে একটা কথা আছে। কিন্তু এই ক্রস-কালচার কখনো কখনো খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর উদাহরণ ভূরি ভূরি। তবে ব্যতিক্রম সব সময়ই ব্যতিক্রম।
রাকিব কফির কাপে আবার চুমুক দিল। কফি এরই মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গেছে। মাথার ওপর শীতের কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। সে পরনের গাউনের কলারটা তুলে দিল। কিন্তু কলারে তো মাথা ঢাকে না। এই কুয়াশায় ঠান্ডা লাগতে পারে। এভাবে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তারপরও তার দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হলো।
রাকিব ঠান্ডা কফিটা এক চুমুকে শেষ করে কবিতাটার কথা না ভেবে

নদীর কথা ভাবতে শুরু করল। নদী এখনো তার নাবিদ ভাইয়ের দোকানে রোববারেই কাজ করে। এই সেমিস্টারটা শেষ হলে সে শনিবারেও কাজ শুরু করবে।

রাকিব ভাবল, নদী এখন তার নাবিদ ভাই, জুঁই ভাবি ও মৌনতাকে নিয়ে বেশ ভালোই আছে। মাঝে মধ্যে মৌনতাকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়। নদী এখন নিজে গাড়ি চালায়। যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে যেতে যেতে পারে। মূলত গাড়িটা রাকিবই নদীকে দিয়েছে। তার পুরোনো গাড়িটা। পুরোনো গাড়ি বলতে একেবারে পুরোনো গাড়ি নয়। আট বছরের পুরোনো মডেল। এখনো বেশ ঝকঝকে তকতকে আছে। নদী তো বলেছে, সে গাড়ি কিনলে এত ঝকঝকে তকতকে দামি গাড়ি কিনতে পারত না। কালো রঙের গাড়ি হওয়াতে গাড়িটা আরও ঝকঝকে তকতকে লাগে।

রাকিব একটা ফোর হুইল টয়োটা প্রাডো কিনেছে। মেটালিক ব্লু। নদী অবশ্য তার জন্য মেরুন রঙের একটা গাড়ি পছন্দ করেছিল। টয়োটা ক্লুগার। কিন্তু টয়োটা ক্লুগার ফোর হুইল ড্রাইভ নয়। অল হুইল ড্রাইভ।

রাকিব তার প্রাডো গাড়িতে নদীকে নিয়ে একদিনই দূরে কোথাও ঘুরতে গেছে। অবশ্য খুব বেশি দূরে নয়। গর্ডনটন জিলং টি এস্টেটে। গর্ডনটন জিলং টি এস্টেট নামেই টি অ্যাস্টেট। আসলে সেখানে কোনো চা বাগান নেই। মূলত একটা পর্যটকদের জন্য একটা পিকনিক স্পট গড়ে তোলা হয়েছে। তারপরও সেদিন পুরো বিকেলটা ওখানে তাদের বেশ ভালো কেটেছে।

রাকিব একটা মধ্যমা আঙুলে কফির কাপটা ঝুলিয়ে রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল। সন্ধ্যাটা এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। রাতের উঠতি ভাগ। তার সময়টা যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না। আবার তার ব্যালকনি থেকেও সরতেও ইচ্ছে করছে না। তখনো ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক আসছে। বাসার ভেতরের লাউঞ্জের আলো খানিকটা ব্যালকনিতে এসেও পড়েছে। ম্যাকফার্লেন স্ট্রিট ধরে দু-একটা গাড়ি আসাযাওয়া করছে। গাড়ির হেডলাইটের বিস্তৃত আলো ছড়িয়ে পড়তে পড়তেই আবার উঠতি রাতের নিষ্প্রভ আলোছায়াটা থমকে দাঁড়াচ্ছে।

একটা গাড়ি হেড লাইটের বিস্তৃত আলো ছড়িয়ে এসে রাকিবের বাসার ড্রাইভওয়েতে এসে থামল। রাকিব অবাক হয়ে দেখল, গাড়িটা কালো। তার গাড়িটা চিনতে অসুবিধা হলো না। কিন্তু গাড়িটা চিনেই রাকিব মনে মনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

নদী যে এই কালো গাড়িটা নিয়ে আগে কখনো রাকিবের বাসায় আসেনি, তা নয়। বেশ কয়েকবারই এসেছে। কিন্তু এই সময়? হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে?

নদী গাড়ি থেকে নেমেই প্রথমে রাকিবের ফ্ল্যাটের ওঠার দোতলার সিঁড়িটার দিকে তাকাল। পরক্ষণই কী ভেবে সে রাকিবের বাসার ব্যালকনির দিকে দৃষ্টি ফেলল। দৃষ্টি ফেলেই সে দেখতে পেল, এই শীতের কুয়াশার মধ্যেও রাকিব ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।

নদী নিচ থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, এই যে কবি সাহেব, আপনি এই শীতের মধ্যেও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

রাকিব কিছু না বলে হাসল।

এই আবছায়া অন্ধকারে অবশ্য রাকিবের এই হাসি নদীর দৃষ্টিগোচর হলো না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, কথা বলছেন না যে?

রাকিব এবার সরল উত্তর দিল, কফি খাচ্ছিলাম তো। শীত-ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে গরম কফি খাওয়ার মজাই আলাদ।

- বেশ ভালো। কবিতার ভাব আসেনি তো?

- হ্যাঁ, বলতে পার।

- তাও বেশ ভালো। কিন্তু কবি সাহেব, আমি যে আপনাকে ফোন দিয়েছি, ধরেননি কেন?

- কই, ফোন দিয়েছিলে নাকি?

- একবার নয়, কয়েকবার। প্রথমে মোবাইলে। পরে ল্যান্ড নম্বরে। দুটোর একটাও ধরেননি।

- স্ট্রেঞ্জ! আমি মোবাইল বা ল্যান্ড ফোন কোনোটারই শব্দ পাইনি। মোবাইল ও ল্যান্ড ফোন দুটোই বেডরুমে তো, তাই হয়তো।

- কিন্তু আমারও কেমন জানি মনে হয়েছিল, আপনি বাসায়। আমি আজ বিকেলে নাবিদ ভাইয়ার দোকানে গিয়েছিলাম। ওখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত জুঁই ভাবি ও মৌনতার সঙ্গে কাটিয়েছি। ফেরার পথে ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। তাই ফোন দিয়েছিলাম।

রাকিব বলল, সরি। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম মনে হয়। তাই শুনিনি।
নদী নিচ থেকে বলল, হয়েছে। আপনাকে আর সরি বলতে হবে না। এখন আপনি কি নিচে আসবেন, নাকি আমাকে ওপরে আসতে হবে?
রাকিব তাড়াতাড়ি বলল, এটা আবার কী কথা? তুমি ওপরে আস।
নদী বলল, না, মানে, আমরা আজ একটু বাইরে খাব তো। তাই বলছিলাম কী, আপনি যদি রেডি থাকেন, তাহলে সরাসরি নিচে চলে আসেন। ওপরে উঠে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমার বেশ ক্ষুধা পেয়েছে।
রাকিব বলল, আমি রেডি নই। তুমি ওপরে আস। আর আমরা মানে, কে কে রেস্টুরেন্টে খাবে?
নদী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, আমরা মানে, আমি আর আপনি। আর আজ আমি আপনাকে খাওয়াব।
রাকিব ব্যালকনি ছেড়ে ভেতরে এসে দরজা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, তুমি খাওয়াবে মানে?
নদী দরজা গলে লাউঞ্জে ঢুকে বলল, আমি খাওয়াব মানে আমার টাকায় খাওয়াব। আমি নাবিদ ভাইয়ার দোকানে কাজ নেওয়ার পর সপ্তাহে একদিন কাজ করি আর যা-ই করি, বেতন তো পাচ্ছি। আগের কিছু টাকা জমিয়ে মাকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলাম। আজ আপনাকে নিয়ে ডিনার করব।
- তুমি খাওয়াবে কেন?
- আমি খাওয়াব না কেন?
- না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, তুমি সপ্তাহে মাত্র একদিন কাজ কর। কী ইবা টাকা পাও?
- যা পাই, এতে আমাদের আজকের ডিনার হয়ে যাবে। আজ কিন্তু কারি পটে তন্দুরি চিকেন আর নান রুটি খেলে হবে না। আজ আরও অনেক কিছু খেতে হবে।
রাকিব মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা।

ছয়

গত দুই দিন ধরে জাহিদ কাজে যায়নি। প্রথম দিন লাকি ভাবিকে তাওরাঙ্গা সিমেট্রিতে দাফন করা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় দিন সে হেদায়েত হোসেনকে সময় দিয়েছে। আজমল হোসেনও এই দুই দিন কাজে যাননি। কিন্তু আজ খুব সকালে জাহিদের ঘুম ভাঙে হেদায়েত হোসেনের ফোন পেয়ে। কিউই ফলের বাগানের মালিক তো আর বুঝতে চাইবে না, হেদায়েত হোসেনের স্ত্রী গত পরশু ভোরে মারা গেছে বলে তার বাগানের কাজ থেমে থাকবে। নতুন অরচার্ডের কাজ। কিউই ফলের উইন্টার প্রুনিং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়।
জাহিদ জানে, নিউজিল্যান্ডের মানুষের জীবনযাত্রা এমনই। এদের বাবা মারা গেলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। মা মারা গেলে একটা আহা শব্দ করে। আর স্ত্রী মারা গেলে ভেতরে ভেতরে খুব খুশি হয়। জাহিদ মাঝে মধ্যে ভাবে, একটা পোষা বিড়াল বা কুকুরের মারা গেল তারা যে পরিমাণ কষ্ট পায়, বাবা-মা বা স্ত্রী মারা গেলে এর সিকি পরিমাণ কষ্ট পায় না। বরং বাবা-মা বা স্ত্রী মারা গেলে সিমেট্রিতে দাফন করতে দেরি, বাসায় ফিয়ে ফিউনারেল পার্টি নামে মদ খেয়ে আমোদ-ফুর্তি করে সেলিব্রেট করতে দ্বিধা বা দেরি করে না।
বাইরে সকালটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। শীতের সকাল বলে বাইরে রোদটা এখনো কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। আজমল হোসেন সেই যে টয়লেটে ঢুকেছেন, এখনো বের হওয়ার নাম নিচ্ছেন না। আজমল হোসেনের এ একটা বড় সমস্যা। যখন তাকে কোথাও তড়িঘড়ি করে যেতে বলা হয় তখনই তিনি সবচেয়ে বেশি দেরি করেন।
জাহিদ ভেবে পেল না, আজমল স্যার কখন টয়লেট থেকে বের হবেন, কখন নাশতা করবেন? কাজের কাপড়চোপড়ও তিনি পরেননি। তাদের স্লিপ আউটে টয়লেট একটাই।
জাহিদ এদিকে নাশতা সেরে দুপুরের লাঞ্চবক্সও সাজিয়ে ফেলেছে। কাজের কাপড়চোপড় পরে বসে আছে। আজমল হোসেন টয়লেট থেকে বের হলে সে একবার টয়লেটে যাবে। তারপর সে মাকিতুর উদ্দেশ্যে বের হবে। তাওরাঙ্গা শহর থেকে মাকিতুর কিউই ফলের অরচার্ড প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার দূরে। আজ হেদায়েত হোসেন অরচার্ডে যাবেন না। হেদায়েত হোসেনের এক বন্ধু মোজাম্মেল হোসেন আজ সুপারভাইজার হিসাবে সবার কাজ দেখাশোনা করবেন।
ওদের বাসা থেকে বের হতে হতে আটটা বেজে গেল। তাওরাঙ্গা শহর ছাড়তে ছাড়তে সোয়া আটটা। বাইরে ততক্ষণে কুয়াশা ভেদ করে রোদ উঠে গেছে। শীতের রোদ। চারদিকে একধরনের মিষ্টি আমেজ ছাড়াচ্ছে। আজমল হোসেন জাহিদের পাশে বসে ঝিমোচ্ছেন। অথচ গতরাতে তাঁর কিন্তু ভালো ঘুম হয়েছে। রাত আটটার মধ্যেই খেয়েদেয়ে ঘুমোতে চলে গেছেন। এক ঘুমে সকালে উঠেছেন। এদিকে জাহিদ বরং কী এক মানসিক অস্থিরতায় রাত বারোটার আগে ঘুমাতে যেতে পারিনি। সে লেপ মুড়ি দিয়ে লাউঞ্জে বসে অযথাই টিভি দেখছিল। তবে টিভি দেখার চেয়ে হেদায়েত হোসেনের কান্নার দৃশ্যটাই তার চোখে ভাসছিল বেশি।
গাড়িটা যাচ্ছে স্টেট হাইওয়ে টু ধরে মাউন্ট মাঙ্গানুইর বে-ফেয়ারের অভিমুখে। বে-ফেয়ারের সামনে থেকে তারা তাওরাঙ্গা ইস্টার্ন লিঙ্ক ধরে টিপুকি শহরের পাশে মাকিতু রোডে উঠবে। মাকিতু রোড ধরে কয়েক কিলোমিটার ভেতরে গেলেই দ্য সিকা অরচার্ড। দিঘল মাকিতু রোডের পুরোটাই দুই পাশে বিশাল-বিস্তৃত কিউই ফলের অনেকগুলো অরচার্ড। তারা আজ দ্য সিকা অরচার্ডে কাজ করবে।
বে-ফেয়ারের পাশ দিয়ে তাওরাঙ্গা লিঙ্ক রোডে মোড় নিয়ে জাহিদ ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। নয়টার দিকে সে মাকিতু রোডের দ্য সিকা অরচার্ডে গিয়ে পৌঁছলেও মনে হয় না কাজ বুঝে নিয়ে সাড়ে নয়টার আগে তারা কাজ শুরু করতে পারবে। এমনিতে তারা সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়।
পাশের সিটে বসে আজমল হোসেন তখনো ঝিমোচ্ছেন। জাহিদ আজমল হোসেনের দিকে তাকিয়ে ভাবল, তাঁকে দেখে কে ভাববে তিনি হাজার একটা সমস্যা নিয়ে দিনযাপন করছেন? কিন্তু তিনি যেখানে বসেন সেখানেই কাঁত হয়ে নাক ডেকে ঘুমাতে পারেন। অথচ তার মাথার ওপর অবৈধ অভিবাসী হওয়ার বিশাল চাপ। যদিও এখানে কেউ শত্রুতাবশত নির্দিষ্ট করে পুলিশ স্টেশানে বা ইমিগ্রেশনে কারও অবস্থান ও ঠিকানা জানিয়ে রিপোর্ট না করলে তারা কাউকে বিরক্ত করে না। কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলে পুলিশ বা ইমিগ্রেশন অফিসার নিজ থেকে খুঁজে খুঁজে অবৈধ অভিবাসী বের করে না। এ জন্য অনেক অবৈধ অভিবাসী আট-দশ বা পনেরো বছর ধরে নির্বিঘ্নে কাজ করে যাচ্ছে। ভাগ্য ভালো হলে আজমল হোসেনও তাই করতে পারবেন।
টিপুকি শহরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে জাহিদ শহরটা ভালো করে দেখল। ছোট্ট একটা শহর। কিন্তু বেশ গোছালো। নিউজিল্যান্ডের প্রত্যেকটা ছোটবড় শহরই বেশ গোছালো ও পরিষ্কার। তবে টিপুকি শহরের বিশেষত্ব হলো, এ শহরকে বলা হয়- দ্য কিউই ফ্রুট ক্যাপিটাল অব নিউজিল্যান্ড। শহরটার চারপাশে মাইলের পর মাইল শত শত কিউই ফলের অরচার্ড বিছিয়ে রয়েছে। এই কিউই ফলটা জাহিদ যখন প্রথম দেখে, তখন সে খুবই অবাক হয়েছিল। ছোট্ট আঁশযুক্ত চামড়া। ভেতরে সবুজ সংযুক্ত কোয়া। কোয়াগুলো অবশ্য আলাদা করা যায় না। কিন্তু খেতে গেলে মনে হয়, কী একটা নরম শীতল বস্তু যেন অন্ত্র নালি দিয়ে পেটের ভেতরে ঢুকছে। স্বর্গের নেয়ামত ফল বুঝি এমনটাই হয়!
নিউজিল্যান্ডের কৃষি অর্থনীতির একটা বড় অংশ আসে এই কিউই ফল থেকে। আপেল, কিউই ফল ও ডেইরি ফার্ম- এই তিনটা সেক্টরের ওপরই নিউজিল্যান্ডের কৃষি অর্থনীতি নির্ভর করে।
জাহিদ আবার আজমল হোসেনের দিকে তাকাল। আজমল হোসেন এখনো ঝিমোচ্ছেন। ঝিমানোর তালে তাঁর ঘাড়টা একবার বামে ঝুঁকে পড়ছে তো পরক্ষণই ডানে ঝুঁকছে।
আজমল হোসেনকে এভাবে ঝিমোতে দেখলে জাহিদের প্রথম প্রথম বেশ বিরক্ত লাগত। কিন্তু আস্তে আস্তে তা গা সহা হয়ে গেছে। হকস বে অঞ্চলের আপেল বাগানগুলো হেস্টিংস শহর থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। পনেরো-বিশ মিনিট ড্রাইভ করেই একেকটা আপেল অরচার্ডে চলে যাওয়া যেত। কিন্তু বে অব প্লেন্টির কিউই ফলের অরচার্ডগুলো তাওরাঙ্গা শহর থেকে অনেক দূরে দূরে। কোনো কোনো কিউই ফলের অরচার্ডে যেতে এক ঘণ্টার মতো লেগে যায়।
জাহিদ টিপুকি শহর পেছনে ফেলে মাকিতু রোডে উঠে আবার আজমল হোসেনের দিকে তাকাল। এরই মধ্যে আজমল হোসেন ঝিমোনি থামিয়ে উদাস হয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। তিনি কিউই ফলের একেকটা অরচার্ড দেখছেন।

জাহিদ মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, স্যার, ঘুম ভেঙেছে?
আজমল হোসেন মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালেন। মুখে কিছু বললেন না।
জাহিদ দুই পাশের কিউই ফলের প্রতিটা অরচার্ডের দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে এগোচ্ছে। সে দ্য সিকা অরচার্ডটা চেনে না। আগে কখনো সেই অরচার্ডে কাজ করেনি। মাকিতু রোড কান্ট্রি সাইডের রাস্তা বলে পথটা প্রায় ফাঁকা।
জাহিদ জিজ্ঞেস করল, স্যার, কী ভাবছেন?
আজমল হোসেন হাসলেন। বললেন, না, তেমন বিশেষ কিছু না। তবে একটা কিছু যে ভাবছি, তা ঠিক।
- কী সেটা?
- নিউজিল্যান্ড দেশটা এত সুন্দর। কিন্তু কাজগুলো এত কঠিন কেন?
জাহিদ বলল, কাজগুলো কী এমন কঠিন স্যার? হয়তো আমার-আপনার কাছে কঠিন। কিন্তু অনেকে তো বিশ-পঁচিশ বছর ধরে এই কাজটা করছে। এ দেশের বহুলোক আছে, যারা সারাজীবন এই কাজটা করে পরে অরচার্ডের মালিক হয়েছে।
আজমল হোসেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ।
- আপনি তো এই কাজটা বেশ সুন্দরভাবেই করতে পারেন, তাই না?
- হ্যাঁ, আপেল অরচার্ডের কাজের চেয়ে কিউই ফ্রুট অরচার্ডের কাজ সহজে করতে পারি। আসলে মই বাইতে হয় না তো, তাই...!
- জি, ঠিক বলেছেন।
মাকিতু রোড ধরে খানিকটা যেতেই জাহিদ দেখল, এক বাঙালি কন্ট্রাক্টর একটা কিউই ফলের অরচার্ডের গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। বিশাল-বিস্তৃত কিউই ফলের অরচার্ডে শ্রমিকরা যাতে হারিয়ে না যায়, এ জন্যই সেই কন্ট্রাক্টর গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই জাহিদ সিকা অরচার্ডের মুখে মোজাম্মেল হোসেনকে দেখল।
জাহিদ গেটের মুখে গাড়ি থামাতেই মোজাম্মেল হোসেন বললেন, আমি তোমাদের জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। অন্য ওয়ার্কাররা কাজ শুরু করে দিয়েছে। এখানে অনেকগুলো বগুক, তোমরা যদি খুঁজে না পাও?
জাহিদ বলল, আমি বুঝতে পেরেছি। আজ কোন ব্লকে কাজ?
- এ-ব্লক থেকে শুরু হবে।
- আমরা নম্বর ধরে ধরে খুঁজে বের করতে পারতাম। আপনি শুধু শুধুই আমাদের জন্য এখানে কষ্ট করে দাঁড়িয়েছিলেন।
- আরে, না। কষ্ট কীসের? তোমরা টিপুকি বা মাকিতু এরিয়ায় নতুন কাজ করতে এসেছ তো, যদি ভুল অরচার্ডে চলে যাও?
জাহিদ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। বলল, ঠিকই বলেছেন। এর আগে ওমাহোর দিকে কয়েকটা অরচার্ড ভুল করে ফেলেছিলাম। হেদায়েত ভাই গাড়ি নিয়ে এসে আমাদের খুঁজে বের করেছেন।
মোজাম্মেল হোসেন হেসে বললেন, আসলে হেদায়েত ভাইই আমাকে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন।
- ও, তাই! আচ্ছা মোজাম্মেল ভাই, গাড়ি কোথায় পার্ক করব?
- ওই তো, গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে শেডের সামনে পার্ক করবে।
- আপনি গাড়িতে উঠে বসুন। শুধু শুধু হাঁটবেন কেন?
- না না, অসুবিধা নেই। ওই তো গেটের পাশেই শেড। তুমি ওখানে গিয়ে গাড়ি পার্ক কর।
জাহিদ আর দ্বিরুক্তি না করে গাড়িটা শেডের কাছে নিয়ে পার্ক করল। সেখানে সারি করে আরও কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা। জাহিদ ও আজমল হোসেন লোপার ও গ্লাবস হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল।
মোজাম্মেল হোসেন হেঁটেই গেট থেকে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। পাশাপাশি সিকা অরচার্ডের এ-ব্লকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন, হেদায়েত ভাইয়ের খবর কী?
জাহিদ বলল, খবর আর কী, মোজাম্মেল ভাই। ভাবি মারা গেছেন দুই দিন হয়নি। এরই মধ্যে হেদায়েত ভাই আর কতটুকু ভালো থাকতে পারবেন?
- তুমি ঠিকই বলেছে, জাহিদ। তবে ভাবিকে নিয়ে হেদায়েত ভাই সারাটা জীবনই টেনশনে কাটিয়েছেন।
- কেন? কোনো সমস্যা ছিল নাকি?
- সমস্যা মানে, বড় সমস্যা।
- কী সমস্যা?
- ভাবি তো মেন্টালি অসুস্থ ছিলেন। বলতে পার, তিনি মানসিক রোগী ছিলেন।
- বলেন কী! আমি তো গত দেড় মাসে তা দেখিনি? বরং লাকি ভাবিকে আমার একজন চমৎকার চুপচাপ ধরনের মহিলা বলে মনে হয়েছে।
- হঠাৎ করে দেখলে তাই মনে হয়। তিনি সব সময় যে মেন্টালি অসুস্থ থাকতেন, তা নয়। বছরের দুই মাস বা তিন মাস অসুস্থ থাকতেন। বিশেষ করে শীতকালে। মাঝেমধ্যে তিনি মানুষজন দাওয়াত দিয়ে বাসা থেকে উধাও হয়ে যেতেন। রাতের বেলায় তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কখনো কখনো তিনি মধ্যরাতে হেঁটে সমুদ্রের সৈকতে একা একা চলে যেতেন। তখন হেদায়েত ভাই এখানে-সেখানে খুঁজে বেড়াতেন। তুমি মনে কর না, তিনি এবারই প্রথম ওষুধ খেয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। এর আগেও এমনটা হয়েছে। তবে এবার তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলেন।
জাহিদ একটা ভারী নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ব্যাপারটা সত্যি খুব দুঃখজনক।
মোজাম্মেল হোসেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছে।

সাত

রোববারে তো সম্ভব হয় না। সেদিন নদী তার নাবিদ ভাইয়ের দোকানে সারাদিন কাজ করে। তাই শনিবারে রাকিব কোনোমতেই নদীর কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় না। আজকাল সে নিজ থেকে অন্য কাউকে ফোন করুক বা না করুক, নদীকে সময়-সময় ফোন করে। শনিবার সকাল হলে তো কোনো কথাই নেই। ঘুম থেকে উঠেই একটা ফোন দিবে। সারাদিনের পরিকল্পনার কথা কখনো নিজ থেকে বলবে, কখনো নদীর কাছ থেকে শুনবে।
শনিবারে সকালে নয়টা-দশটার দিকে বের হয়ে তারা দীর্ঘক্ষণ ধরে নদীর পাড় হাঁটে। কাছাকাছি কোথাও যায়। তামাহিরি ভিলেজ, ছোট্ট শহর মরিন্সভেল, অটোরোহাঙ্গা কিউই পাখির ফার্ম, হান্টলি রিভার ড্যাম ও র‍্যাগলেন বিচ। এরই মধ্যে দূরের কোথাও বলতে ওয়াইটুমু গুহায় গিয়েছিল।
তারা ওয়াইটুমু গুহায় গিয়েছিল গত শনিবারে। হ্যামিল্টন থেকে মাত্র চুরাশি কিলোমিটার দূরে ওয়াইটুমু গুহা। প্রায় পাঁচ বছর আগে ছোট ফুফা ও ছোট ফুফু যখন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে হ্যামিল্টনে বেড়াতে এসেছিলেন, তখন রাকিব তাদেরকে ওয়াইটুমু গুহায় নিয়ে গিয়েছিল। সেই ভ্রমণটা অবশ্য তেমন আনন্দ ভ্রমণ হয়নি। ছোট ফুফু তো কোথাও গেলে কোনো কিছু দেখার আগে শুধু কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকেন। সেবারও তিনি তাই করেছিলেন।
এবার রাকিব নদীকে নিয়ে ওয়াইটুমু গুহায় ঘুরতে গিয়ে বেশ চমৎকার একটা দিন কাটিয়েছে। ওয়াইটুমুর গ্লো-ওয়ার্ম গুহাটা মনে হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুহার একটা। বিশাল একটা পর্বত। পর্বতের ভেতরটা প্রায় ফাঁকা। গুহার বিস্তৃতি এত যে, একটা চারতলা দালান যেন গুহার ভেতর প্রাকৃতিকভাবে বানানো হয়েছে। গুহার ভেতরটা অবশ্য চারটা স্তরেই বিভক্ত। গুহার ভেতরে ওঠানামার জন্য মাটি কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। এমনকি গুহার ভেতর একটা হলরুমও আছে। যেখানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে গান গাওয়া যায়। অনেক সময় ট্যুর গাইড সেখানে দাঁড়িয়ে কাউকে গান গাইতে অনুরোধ করে। পর্যটকদের মধ্যে কেউ গান গাইতে জানলে তখন সাড়া দেয়। জোরে গলায় গান গেয়ে ওঠে। কোন ভাষায় গানটা গাইল, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। গুহার ভেতর হলরুমটায় গানের বিপরীতে যে প্রতিধ্বনি হয়, তা সত্যি অকল্পনীয়। মনে হয় যেন বিশাল থিয়েটারের ভেতর গান গাওয়া হচ্ছে। সেদিন রাকিবকে অবাক করে দিয়ে ট্যুর গাইড অনুরোধ জানাতেই নদী একটা রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে উঠেছিল, আমারও পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো...!
নদীর গানের গলা তেমন ভালো নয়। ফ্যাসফ্যাসে গলা। কিন্তু তারপরও সেদিন রাকিবের কাছে নদীর গাওয়া গানটা তার এ জীবনে শোনা একটা শ্রেষ্ঠ গান মনে হয়েছিল। বাসায় ফেরার পরও তার কানে গানের কথাগুলো বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।
তবে ওয়াইটুমু গ্লো-ওয়ার্ম গুহার যেটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল, গুহার ভেতর দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। যে নদীর নাম ওয়াইটুমু নদী। গুহার ভেতরেই নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে। তারা সারি করে নৌকায় ওঠে। চারদিকে কোনো আলো নেই। মনে হচ্ছিল যেন নিস্তব্ধ ও নিঃসীম রাত। অসংখ্য গ্লো-ওয়ার্ম পোকার ঝিকিমিকি আলো আকাশের তারার

মতো মনে হয়েছিল। মূলত গ্লো-ওয়ার্ম পোকাগুলোর জন্যই গুহার এ পাশটার সব আলো নিভিয়ে রাখা থাকে। গ্লো-ওয়ার্ম পোকা আলো সহ্য করতে পারে না।

গুহার ভেতর ওয়াইটুমু নদীতে নৌকায় ওঠার পর যে দৃশ্যটা এখন রাকিবের অনুভূতিতে নাড়া দিচ্ছে। অন্ধকারে নৌকায় তার পাশে বসে নদী শক্ত করে তার হাত চেপে বসেছিল। অন্ধকারে নৌকায় বসে নদী একটু একটু ভয়ও পাচ্ছিল। কিন্তু নদী যেন ভয় পাওয়ার চেয়ে তার সমস্ত অবলম্বন রাকিবের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল।

রাকিব এখন কফির কাপ হাতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভাবল, আহা, নদী সেদিনের মতো কবে তার সমস্ত জীবনের অবলম্বন তার ওপর ছেড়ে দিবে? ছোট্ট ছোট্ট সুখ, ছোট্ট ছোট্ট অনুভূতি, আর ছোট্ট একটু ভালোবাসা...! রাকিব আজকাল নদীকে নিয়ে ভাবতে পারে। চলতে চলতে, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় এটুকু বিশ্বাস তার মধ্যে জন্মেছে, নদীকে নিয়ে সত্যি সে কিছু একটা ভাবতে পারে।

গত চার সপ্তাহ ধরে নদী নয়টা-দশটার মধ্যে রাকিবের বাসায় চলে এলেও আজ সে একটু দেরি করে আসবে। নদী বলেছে, এগারোটা-সাড়ে এগারোটার মধ্যে এখানে এসে পৌঁছাবে। আজও সে নয়টা কী দশটার মধ্যে চলে আসত। মাঝখানে মৌনতা ঝামেলাটা বাধিয়েছে। সেও নাকি তাদের সঙ্গে নদীর পাড়ে হাঁটতে চায়। এ জন্য মৌনতা নদীকে সকাল থেকে কয়েকবার ফোন দিয়েছে।

মৌনতার ব্যাপারটা নদী ঝামেলা হিসাবে বললেও আসলে সে ওটা কথার কথা বলেছে। মৌনতা নদী বলতে যেমন অজ্ঞান, নদীও মৌনতা বলতে অজ্ঞান। তাদের মধ্যে অসমবয়সী কী যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক! রাকিবও মৌনতাকে বেশ পছন্দ করে। বেশ মিষ্টি মেয়ে মৌনতা। তার কথাগুলো যেন আরও মিষ্টি। রাকিব মৌনতাকে যতবারই দেখে ততবারই তার মেয়ে সাদিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। সাদিয়া বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সে এভাবে বায়না ধরত!

রাকিব কফির কাপে চুমুক দিয়ে দিঘল দৃষ্টি মেলে তাকাল। শীতকালটা প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু শীত যেন আরও জেঁকে পড়েছে। সকালে ঘাসের ওপর হালকা স্তরে বরফ জমে। উত্তর দ্বীপের ফাকাপাপা শহরে তো শীতকালে সব সময়ই তুষারপাত হয়। এবার তাওপো শহর ও নিউ প্লে মাউথ শহরেও বেশ তুষারপাত হয়েছে। গত রাতের খবরে দেখিয়েছে, এখনো শহর দুটোতে তুষারপাত হচ্ছে। শীতকালে দক্ষিণ দ্বীপের প্রায় সব শহরে তুষারপাত হওয়া অনেকটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

সকালের দিকে ঘাসের ওপর হালকা স্তরের বরফ জমলেও এখন এর লেশ মাত্র নেই। বরং আজ সকাল থেকেই চমৎকার রোদ উঠেছে। বসন্ত আসি আসি করছে বলে এখনই দক্ষিণের হিন হিন বাতাস বইতে শুরু করেছে। যদিও দক্ষিণের বাতাসটা খুব শীতল। জামাকাপড়ের ওপর সুয়েটার, সুয়েটার ওপর ভারী জ্যাকেট বা ওভারকোট না পরলে শীতের বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

রাকিব একটা জিন্সের প্যান্টের ওপর পোলো গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর একটা ওলের সুয়েটার। সুয়েটারের ওপর একটা লেদারের জ্যাকেট পরে তৈরি হয়েই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। নদী ও মৌনতা এলেই সে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে যাবে।

রাকিব কফির কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার আগেই দেখল নদী তার গাড়িটা ম্যাকফার্লেন স্ট্রিট থেকে তার বাসার ড্রাইভওয়ের দিকে মোড় নিচ্ছে। গাড়ির ভেতর থেকেই মৌনতা হাত তুলল।

গাড়িটা ড্রাইভওয়েতে পার্ক করতেই মৌনতা ত্বরিত গাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, আংকেল, তুমি রেডি তো?

রাকিব বলল, হ্যাঁ।

- তাহলে এখনো কফির কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

- তোমরা আসতে দেরি করছ বলে।

- না না, মোটেও না। আমরা এগারোটায় আসব বলেছি, ঠিক এগারোটায় এসেছি। তুমি ঘড়ি দেখতে পার।

নদী গাড়ি থেকে নেমে মৌনতাকে বলল, হয়েছে, তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না।

মৌনতা বলল, ফুফি, তুমি ভুল কথা বলছ কেন?

নদী মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, কী ভুল কথা?

- তুমি বলছ, আমি পাকামো করছি। কিন্তু আমি তো পাকামো করছি না।

- তাহলে কী করছ?

- আমি সত্যি কথা বলছি। বাবা বলেছে, সত্যি কথা বললে পাকামু হয় না।

নদী রাকিবের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখছেন, দেখছেন?

রাকিব মৃদু শব্দ করে হেসে উঠল।

নদী জিজ্ঞেস করল, আপনি রেডি তো?

রাকিব মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ।

- তাহলে আমরা আর ওপরে উঠব না। আপনি নেমে আসুন। আমরা ডাউন টাউন প্লাজা বা হ্যামিল্টন সেন্ট্রালে যাব।

- হঠাৎ সেখানে? আজ নদীর পাড়ে হাঁটবে না?

- সে না হয় বিকেলের দিকে হাঁটব। এখন মৌনতা বায়না ধরেছে সে ড্যান্সিং অ্যান্ড সিংগিং ডল কিনবে।

রাকিব বলল, ও, আচ্ছা।

মৌনতা বলে উঠল, আমি ভাবছি, ফুফি স্টুডেন্ট। তুমি জব কর।

রাকিব জিজ্ঞেস করল, তো?

- তুমি আমাকে ড্যান্সিং অ্যান্ড সিংগিং ডল কিনে দিবে।

- তা না হয় কিনে দিলাম। তোমার দারুণ লজিক।

- আমার বাবাও তাই বলে।

নদী মাঝখান থেকে বলে উঠল, আহা মৌনতা, আমি তোমাকে ডলটা কিনে দিব বলে প্রমিজ করেছি। তুমি তোমার রাকিব আংকেলকে বলছ কেন?

মৌনতা বলল, ড্যান্সিং অ্যান্ড সিংগিং ডলটা কোয়াইট এক্সপেন্সিভ, তাই। তুমি অ্যাফোর্ট করতে পারবে না।

নদী বলল, ওগো আমার পাকনা বুড়ি...!

মৌনতা চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, ফুফি, তুমি আমাকে পাকনা বুড়ি বলবে না তো। দিজ ইজ আন-অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ। আই ডোন্ট লাইক ইট।

নদী বলল, ওকে, ওকে।

রাকিব ব্যালকনি থেকে আবার শব্দ করে হাসল।

আট

বাসায় আজ রান্নাবান্না করতে হয়নি। আগের দিনই জাহিদ ও আজমল হোসেন চার-পাঁচদিনের রান্না এক সঙ্গে করে ফ্রিজে রেখেছে। তাই তারা আজ রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। আজমল হোসেন বেডরুমে লেপ মুড়ি দিয়ে শোয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেছেন। জাহিদ লেপ মুড়ি দিয়ে সোফায় শুইলেও তার এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না। সে সাধারণত রাত সাড়ে নয়টা-দশটার আগে ঘুমাতে যায় না। কখনো কখনো তার ঘুমাতে ঘুমাতে এগারোটা বেজে যায়। বেশিরভাগ সময়ই সে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমায়।

এখন সবে সাড়ে সাতটা বাজে। আজও শীতটা বেশ জেঁকে পড়েছে। বাইরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে না হলেও বড়জোড় চার-পাঁচ ডিগ্রি হবে। ভোরের দিকে তা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যাবে। আজ তাদের কাজ বেশি দূরে ছিল না। তাওরাঙ্গার কাছাকাছি বেথেলেহ্যাম রোডে ছিল। বেথেলেহ্যাম আবাসিক এলাকার কাছাকাছি বেথেলেহ্যাম কিউই ফলের অরচার্ডে তাদের কাজ ছিল। তাদের বাসা থেকে মাত্র দশ মিনিটের ড্রাইভ। আরও সাতদিন ওখানে কাজ চলবে।

জাহিদ সোফায় শুয়ে আজ টিভি চালু করল না। বুধবারে রাতে টিভিতে বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম থাকে না। সাধারণ টক শো, বিভিন্ন ধারাবাহিক অনুষ্ঠান, ধারাবাহিক নাটক আর লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপন। মঙ্গলবারেও একই অবস্থা। শুক্র-শনি ও রোববারে টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে মুভি চলে। সোমবার বা বৃহস্পতিবারেও কোনো কোনো চ্যানেলে নতুন বা পুরোনো মুভি দেখায়।

জাহিদ সাধারণত ধারাবাহিক নাটকগুলো দেখে না। টক শো বা ধারাবাহিক অনুষ্ঠানগুলো তো বিরক্তিকর। জাহিদদের বাসায় স্কাই স্যাটেলাইটের কোনো কানেকশন নেই। কোনো কালে ছিলও না। তাই ইচ্ছে করলেই সে যেকোনো মুভি চ্যানেলে মুভি দেখতে পারে না।

জাহিদ অনেকক্ষণ ধরেই সোফায় ঝিম মেরে শুয়ে আছে। সে ভালো করেই জানে, তার এখন মোটেও ঘুম আসবে না। তারপরও সে সোফায়

পা মেলে টান টান হয়ে শুয়ে রইল। তার আজ শিরিনকে খুব মনে পড়ছে। শিরিনের সঙ্গে তার কথা হয় না প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে। তাদের মাঝেমধ্যে এমনটাই হয়। কখনো কখনো তাদের সপ্তাহের সাত দিনই কথা হয়। কখনো আবার এক মাসেও একবার কথা হয় না। তবে জাহিদ জানে, এটা সত্য যে তাদের প্রেমটা যেমনই হোক, শিরিন তার মাকে যেভাবে আগলে রাখছে, অন্য কেউ তা আগলে রাখত না।

শিরিন জাহিদের মামাত বোন। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ কল্যাণে অনার্স পড়ছে। বয়সে জাহিদের চেয়ে দশ বছরের ছোট। তাদের প্রেমটা ঠিক গতানুগতিক পথে প্রেম হয়নি। অনেকটা জাহিদের মার পছন্দেই প্রেমটা হয়। জাহিদ যখন নিউজিল্যান্ড আসে তখন শিরিন সবে কলেজে শুরু করেছে। মার খবরাখবর নেওয়ার জন্য জাহিদের একমাত্র অবলম্বন ছিল শিরিন। সেই থেকে শিরিনের তার প্রতি অপেক্ষা। মা শিরিনকে এক রকম কথাই দিয়ে ফেলেছেন। জাহিদও মেনে নিয়েছে।

শিরিনকে যে জাহিদের ভালো লাগে না, তা নয়। বেশ ভালো লাগে। ফোনে কথা বলতে বলতে, ফেসবুক মেসেঞ্জারে লিখতে লিখতে নিউজিল্যান্ডে আসার পরপরই তাদের প্রেমটা হয়ে যায়। নিউজিল্যান্ডে আসার পরপর জাহিদ শিরিনকে বেশ চিঠি লিখত। ওসব চিঠিতে প্রেমের কথা যতটুকু না, মার কথাই বেশি লেখা থাকত। কিন্তু তারপরও তো চিঠি লেখা হতো। তারপর স্কাইপ, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার আসার পর চিঠি লেখা পায় বন্ধই হয়ে যায়। আজ অনেক দিন পর জাহিদের আবার শিরিনকে একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে। হাতে কোনো কাজ নেই বলেই তার এই ইচ্ছেটা।

টিভির পাশেই বাজারের হিসাব ও কাজের হিসাব রাখার জন্য একটা বড় খাতা। জাহিদ সেই বড় খাতা থেকে দুটো পাতা ছিড়ে শিরিনকে চিঠি লিখতে বসল।

প্রিয় শিরিন

শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিয়ো।

আমি জানি তোমার অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। আমিও এদিকে খুব ব্যস্ত ছিলাম। তাই তোমাকে গত তিন সপ্তাহ রিং করিনি। তোমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। পরীক্ষা শেষে নিশ্চয়ই তুমি আমাদের ওখান থেকে ঘুরে আসবে। মাকে ডাক্তার দেখিয়ো। আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থেকে এসো।

তুমি নিশ্চয়ই আমার চিঠি পেয়ে অবাক হবে। অনেক দিন পর তোমাকে চিঠি লিখছি। চিঠি লিখতে বসে আমার নিজের কাছেই অবাক লাগছে। আজকাল তো কেউ কাউকে চিঠি লিখে না। পৃথিবীতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের চিঠি লেখা প্রায় বন্ধ হয়েই গেছে। আজকাল পোস্ট শপ বা পোস্ট অফিসগুলো দাঁড়িয়ে আছে শুধুমাত্র অফিশিয়াল লেটার আর পার্সেল পাঠানোর জন্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নিউজিল্যান্ডের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখনো একজন আরেকজনকে প্রচুর চিঠি লিখেন। সত্যি বলতে কী, চিঠি লেখায় যে ভাব-ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়, অন্য কোনো মাধ্যমে তা মোটেও সম্ভব নয়।

তোমার সঙ্গে সর্বশেষ যখন কথা বলি তখন তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, আর কত অপেক্ষা করতে হবে? অপেক্ষার কী শেষ নেই? তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার ভালোবাসার কারণেই কিনা, আজ আমার তো নিউজিল্যান্ডে একটা গতি হয়েছে। এখন আমার নিউজিল্যান্ডে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি আছে। এ দেশের সিটিজেন হওয়াটা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু এ দেশি যে মেয়েকে কাগজের বিয়ে করেছিলাম, তার সঙ্গে আমার সেপারেশান হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ডিভোর্স হয়নি। এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী ডিভোর্সের জন্য দুই বছর অপেক্ষা করতে হয়। তারপর আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব। তখন অবশ্য তোমাকে বিয়ে করে নিউজিল্যান্ডে আনতে বেশি সময় লাগবে না। আরেকটু ধৈর্য ধরো লক্ষ্মীটি। এরই মধ্যে তুমি মাস্টার্সটাও শেষ করে আসতে পারবে। আমি নিজে তো টাকাপয়সার অভাবে মাস্টার্স করতে পারলাম না। তোমার সুযোগ আছে, তুমি শেষ করবে না কেন?

আমি এখন যে কাজ করি, কাজটা আমার মোটেও পছন্দের নয়। খুব কঠিন কাজ। কিন্তু অবাক ব্যাপার, আমার কাছে কাজটা কঠিন মনে হলেও আজমল স্যারের কাছে কাজটা কঠিন মনে হচ্ছে না। এমনকি অনেক বাঙালি বধূরাও স্বামীর সঙ্গে গিয়ে কিউই ফ্রুটের অরচার্ডে এই কাজটা করছে। তারা বেশ আনন্দের সঙ্গেই কাজটা করছে। কিউই ফ্রুটের অরচার্ডে কাজ করে এখানে অনেকে দুই-তিনটা বাড়িও কিনেছে। একটা মজার গল্প বলি। এক ভদ্রলোক বউ-ছেলে নিয়ে নিউজিল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ বেড়াতে গিয়েছেন। ভদ্রলোকের ছেলের বয়স আট কী নয় বছর। বাংলাদেশ যাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন ভদ্রলোকের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবা নিউজিল্যান্ডে কী করেন? ছেলে ফটাফট উত্তর দেয়, আব্বু ডালা কাটে, আম্মুও ডালা কাটে। আমিও মাঝেমধ্যে কিউই ফ্রুটের বাগানে গিয়ে ডালা কাটি...! ভদ্রলোকের আত্মীয়-স্বজন তার ছেলের কথা বুঝতে পারে না হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু শিরিন, আমার কাছে কেন কাজটা এত কঠিন মনে হচ্ছে, আমি তা বুঝতে পারছি না। সকালে অরচার্ডে গিয়ে যখন ঘাসের ওপরের পাতলা বরফ পায়ের নিচে মচমচ করে ভেঙে কাজ শুরু করি, তখন দীর্ঘ সারির পাতাহীন কিউই ফ্রুটের গাছগুলো দেখে আমার কাছে বিরানভূমি মনে হয়। কিছুক্ষণ গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে দিশেহারা হয়ে উঠি। আমি দীর্ঘদিন হেস্টিংস শহরে আপেল বাগানে কাজ করেছি। ওই কাজটাও কঠিন। কিন্তু কিউই ফ্রুটের কাজের মতো এত কঠিন না।

আজমল স্যার বেশ ভালো আছেন। আগের মতো টাকাপয়সার টেনশনে ভোগেন না। কোনো কোনো সপ্তাহে তার ইনকাম আমার চেয়েও বেশি হয়। এখানের কাজগুলো কন্ট্রাক্টের কাজ। যত কাজ করবে, তত টাকা। কিন্তু আজমল স্যারকে নিয়ে অন্য আরেকটা টেনশনে আছি। হেস্টিংস শহর ছাড়ার আগে স্যারের ব্যাপারে তোমাকে তো বলেছি। স্যার এখন নিউজিল্যান্ডে অবৈধভাবে বসবাস করছেন। যেকোনো সময় তিনি ইমিগ্রেশন অফিসার বা পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারেন। যদিও অনেকে আট-দশ বছর ধরে অবৈধভাবে বসবাস করে এখানে কাজ করছে।

> গুহার ভেতর হলরুমটায় গানের বিপরীতে যে প্রতিধ্বনি হয়, তা সত্যি অকল্পনীয়। মনে হয় যেন বিশাল থিয়েটারের ভেতর গান গাওয়া হচ্ছে। সেদিন রাকিবকে অবাক করে দিয়ে ট্যুর গাইড অনুরোধ জানাতেই নদী একটা রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে উঠেছিল, আমারও পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো...! নদীর গানের গলা তেমন ভালো নয়। ফ্যাসফ্যাসে গলা। কিন্তু তারপরও সেদিন রাকিবের কাছে নদীর গাওয়া গানটা তার এ জীবনে শোনা একটা শ্রেষ্ঠ গান মনে হয়েছিল। বাসায় ফেরার পরও তার কানে গানের কথাগুলো বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছিল

আজমল স্যার মনে হয় না এ ব্যাপারটা নিয়ে কোনো টেনশনে আছেন। তিনি নিজের বর্তমান অবস্থান মেনেই নিয়েছেন। তবে তিনি যে কিউই ফ্রুটের অরচার্ডে ভালো কাজ করতে পারছেন, এতেই তিনি খুশি। কিন্তু আমি স্যারকে নিয়ে বেশ টেনশানে আছি। এ বছর ইমিগ্রেশন আর পুলিশ মিলে তাওরাঙ্গা-টিপুকির বিভিন্ন কিউই ফ্রুটের অরচার্ডে গিয়ে নিউজিল্যান্ডের অবৈধ বসবাসকারীদের ধরছে। যদিও তাদের আসার আগেই অরচার্ডে খবর চলে আসে। আর কিউই ফ্রুটের অরচার্ড এত বড় যে তাদের আসার খবর শোনা মাত্র দৌড়ে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকা যায়। কিন্তু সমস্যা স্যারকে নিয়ে। তাদের দূর থেকে দেখামাত্র স্যার যে কোথাও গিয়ে দৌড়ে লুকাবে, তার সেই ক্ষমতা বা বুদ্ধিও নেই।

তাওরাঙ্গা শহরটা অনেক সুন্দর। তাওরাঙ্গা শহরের পাশেই মাউন্ট মাঙ্গানুই বিচ। মাউন্ট মাঙ্গানুই বিচটা পৃথিবীর সের দশটা বিচের একটা বিচ। তুমি নিউজিল্যান্ডে এলে তোমাকে নিয়ে প্রাণভরে ঘুরব। নিউজিল্যান্ডে কত কী যে দেখার জিনিস আছে!

অনার্স পরীক্ষার পরপর তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে বলেছিলে। তখন মাকে ডাক্তার দেখিয়ো। এবার বাড়িতে গিয়ে মার কাছেই বেশি থেকো। আমার চিন্তা করো না। আমি অনেক ভালো আছি। কিউই ফ্রুট অরচার্ডের কাজটা আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু এই কাজটা আমি বেশিদিন করব না। হ্যামিল্টনে আমার কলেজ জীবনের এক বন্ধু আছে। ওখানে গিয়ে একটা কোর্সে ভর্তি হব। এখানে লেখাপড়া করলে চাকরি পাওয়া যায়। তুমি আসার আগেই হয়তো চাকরিতে ঢুকব। কিন্তু সমস্যায় আছি আজমল স্যারকে নিয়ে। তবে স্যার যেহেতু কিউই ফ্রুট অরচার্ডের কাজটা করতে পারছেন, তাই তার কাজের অভাব হবে না।

তুমি ভালো থেক লক্ষ্মীটি। শরীরের যত্ন নিও। অনেক ভালোবাসা রইল। ইতি

জাহিদ।

চিঠি লেখা শেষ করে জাহিদ একটা ভারী নিঃশ্বাস নিল। অনেক দিন পর সে কাউকে এত বড় চিঠি লিখেছে। নিউজিল্যান্ডে আসার পরপর প্রথম প্রথম সে শিরিনকে বেশ চিঠি লিখত। তবে সেসব চিঠিতে তার মার কথাই বেশি থাকত। মাঝখানে অনেক দিন সে চিঠি লিখেনি। আজ লিখল।

জাহিদ চিঠিটা ভাঁজ করে খাতাটার ভেতরেই রাখল। তারপর শরীরটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে পা দুটো টান টান করল। ঘড়ির দিকে তাকাল। সবে সাড়ে আটটা বাজে। টিভিটা ছাড়বে কিনা ভাবল। কিন্তু আজ কেন জানি তার টিভি ছাড়তে ইচ্ছে হলো না।

আজমল হোসেন বেডরুমে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। দেয়ালে ঘড়িটা চলছে- টিক টিক, টিক টিক। বাইরে থেকে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আসছে- ঝিঁ-ই-ই, ঝিরিত ঝিরিত। বাইরে যে শীতটা জেঁকে পড়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে এরই মধ্যে কুয়াশার টুপটাপ জল পড়ার শব্দ শোনে। স্লিপ আউটের ছাদটা করোগেটেড আয়রনের। কুয়াশার টুপটাপ জল পড়ার শব্দ, বৃষ্টির শব্দ ভেতরে বসে স্পষ্টই শোনা যায়।

জাহিদ লম্বা সোফাটায় লেপ মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ পা ছেড়ে টান টান হয়ে শুয়ে রইল। সে কনকনে শীতের কারণে লেপ মুড়ি দিয়ে থাকলেও লাউঞ্জে নয় ফিনের একটা ইলেকট্রিক ওয়েল হিটার চলছে। ওয়েল হিটারটা কিছুক্ষণ পরপর তাপমাত্রার ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক ক্লিক শব্দ করছে। এ ছাড়া রাতের একধরনের নিস্তব্ধতার শব্দ।

দরজায় তখনই কেউ একজন নক করল। জাহিদ কান খাঁড়া করল। ভাবল, এই শীতের রাতে তার বাসায় কে আসবে? হেদায়েত ভাই নয় তো?

জাহিদ জিজ্ঞেস করল, কে?

বাইরে হেদায়েত হোসেনই। তিনি গলা বাড়িয়ে বললেন, আমি হেদায়েত। জাহিদ, দরজা খোলো।

জাহিদ ব্যস্তভাবে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল, জি হেদায়েত ভাই, আমি এখনই দরজা খুলছি।

হেদায়েত হোসেন বললেন, তাড়াতাড়ি খোলো। বাইরে মনে হচ্ছে শীত পড়ছে না, বরফ পড়ছে!

জাহিদ দরজা খুলে বলল, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকেন। এই শীতের মধ্যে আসার কী দরকার ছিল? ফোনেই তো কথা বলতে পারতেন?

হেদায়েত হোসেন ভেতরে ঢুকে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসে বলল, কথাগুলো ফোনে বলার মতো না, তাই আসলাম। আর আমার মনটা খুব খারাপ। তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করে যায়।

জাহিদ দরজা বন্ধ করে পূর্বের স্থানে বসতে বসতে বলল, এসেছেন ভালো করেছেন। আপনার কি শীত লাগছে? তাহলে বেডরুম থেকে একটা কম্বল এনে দেই। মুড়ি দিয়ে বসেন। বেডরুমে এক্সট্রা কম্বল আছে।

হেদায়েত হোসেন বলল, না না, লাগবে না। গাউনের নিচে অনেক গরম কাপড় পরেছি। এ ছাড়া তুমি এখানে হিটার চালিয়ে রেখেছ। আমার তেমন শীত লাগছে না।

- আমার লাগছে। লেপের নিচে থেকেও মনে হচ্ছে শীতে জমে যাচ্ছি। আচ্ছা, চা বা কফি খাবেন?

- তুমি খাবে?

- আপনি খেলে হয়তো আমার জন্যও এক কাপ বানাব।

- আচ্ছা, বানাও। কিন্তু তুমি এখন আবার কষ্ট করে বানাবে?

- কষ্ট কীসের? পানি নিয়ে হট ওয়াটার জগ অন করে দিব। চা না কফি খাবেন?

- কফি খাব না। ঘুমের সমস্যা হবে। চা বানাও। রং চা বানাও। চিনি দিও না। ডায়াবেটিস রোগী তো।

জাহিদ সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে বলল, আমিও রং চা-ই খাব।

লাউঞ্জের এক পাশেই ছোট্ট কিচেন। বেঞ্চটপটা যেন আরও ছোট। বেঞ্চটপের এক পাশে হট ওয়াটার জগ। হট ওয়াটার জগে আগে থেকেই পানি অর্ধেক ভরা ছিল। জাহিদ হট ওয়াটার জগটা শুধু অন করে দিল। জাহিদ ছোট্ট শেলফ থেকে দুটো কাপ নিয়ে বেঞ্চটপের ওপর রাখতেই হেদায়েত হোসেন গলা বাড়িয়ে বললেন, এই বাসাটা তোমাদের জন্য খুব ছোট হয়ে গেছে, তাই না?

জাহিদ হেসে বলল, হেদায়েত ভাই, এটা সত্য। বাসাটা আমাদের জন্য আসলেই ছোট। এত ছোট বাসায় আগে কখনো থাকিনি তো। আরেকটা বেডরুম হলেই হতো।

হেদায়েত হোসেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি বুঝতে পারছি। আসলে স্লিপ আউটে দুটো বেডরুম খুব কম থাকে। স্লিপ আউট এক বেডরুমেরই হয়।

- আমি জানি। কিন্তু আমাকে এই ড্রয়িংরুমেই ঘুমাতে হচ্ছে, এই যা।

- কেন, বেডরুমে সমস্যা কী?

- স্যারের নাক ডাকা তো কাছ থেকে কখনো শোনেননি। একবার শুনলে বুঝতেন।

হেদায়েত হোসেন শব্দ করে হেসে ফেললেন। হাসি ধরে রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, স্যার কোথায়? বেডরুমে?

জাহিদ বলল, জি।

- স্যার কী এখন সজাগ?

- না না, সেই কখন কাজ থেকে এসে শাওয়ার করেই দুই মুঠো খাবার মুখে দিয়ে ঘুমাতে চলে গেছেন! হেদায়েত ভাই, আপনি একটু কান পাতেন। স্যারের নাক ডাকার শব্দ আপনার ওখান থেকেও শুনতে পাবেন।

হেদায়েত হোসেন কান পেতে কিছুক্ষণ পর বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হা হা হা।

জাহিদ চায়ের কাপে পাতা দিয়ে হট ওয়াটার জগ থেকে পানি ঢেলে চামচে নেড়ে নিয়ে এল। সে নিজের কাপেও চিনি নিল না। সে যে চিনি ছাড়া চা খায়, তা নয়। কিন্তু তার শেলফ থেকে চিনির কৌটা নামিয়ে চিনি নিতে ইচ্ছে হলো না।

একটা চায়ের কাপ হেদায়েত হোসেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে জাহিদ নিজের সোফায় গিয়ে বসল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, হেদায়েত ভাই, টিভি ছেড়ে দেব?

হেদায়েত হোসেন বললেন, না না, টিভি ছাড়ার দরকার নেই। স্যারের ঘুমের ডিস্টার্ব হবে।

- স্যারের কোনো ডিস্টার্ব হবে না। স্যার ঘুমালে দুনিয়ার কোনো খবর থাকে না। স্যারকে এখান থেকে এক শটা ডাক দেন, আপনি কোনো সাড়া পাবেন না।

- তাই নাকি।

- জি, অনেক দিন ধরে এক সঙ্গে থাকছি তো। স্যারকে আমি ভালো

করেই জানি। তবে ভাবির যেদিন ইন্সিডেন্টটা হলো সেদিন বাসায় ফিরে দেখি স্যার ঘুম থেকে জেগে বসে আছেন। তাকে আর ঘুম থেকে জাগাতে হয়নি।

হেদায়েত হোসেন এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। একটা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়লেন।

জাহিদ বলল, সরি। আপনাকে ভাবির কথা মনে করিয়ে দিলাম!

হেদায়েত হোসেন বললেন, না না, অসুবিধা নেই। তোমার ভাবির জন্য মন খারাপ বলেই তো তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। আচ্ছা, তুমি কত বছর হলো স্যারের সঙ্গে আছ?

- প্রায় ছয় বছর হয়ে যাচ্ছে।

- বেচারা অনেক দিন থেকেও কিছু করতে পারলেন না। স্যারের জন্য সত্যি কষ্ট হয়।

- জি, হেদায়েত ভাই। তবুও তো আপনি স্যারের সব জেনে কাজ দিয়েছেন।

হেদায়েত হোসেন মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে যাওয়ার আগে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। চুমুক দেওয়া মাত্রই বেশ প্রফুল্লচিত্তে বললেন, আহা, মনে হচ্ছে কতদিন পর কেউ এভাবে আমাকে চা বানিয়ে দিয়েছে। তোমার ভাবি চলে যাবার পর আর তো এভাবে কেউ চা বানিয়ে দেয়নি। আমার জীবনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

জাহিদ জিজ্ঞেস করল, ভাবির কথা খুব মনে পড়ছে?

হেদায়েত হোসেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, জাহিদ, মনে তো পড়বেই। ছয় বছর প্রেম করার পর বিয়ে করে ষোল বছর সংসার করেছি। জানি তোমার ভাবির মাথায় একটু প্রবলেম ছিল। বিয়ের আগে বুঝতে পারিনি। কিন্তু এই প্রবলেমটা জেনেও আমরা ষোল বছর সংসার করেছি।

- ভাবি না আপনার খালাত বোন ছিলেন? বিয়ের আগে কি ভাবির প্রবলেমটা ধরতে পারেননি?

- না, তোমার ভাবি খুব সুন্দর ছিল তো। তাই ওসব প্রবলেম কোনো প্রবলেমই মনে হয়নি। আর সে তো পাগল ছিল না। মাঝেমধ্যে পাগলামির ভূত চাপত। পাগল হলে কী তার সঙ্গে ষোল বছর সংসার করতে পারতাম?

জাহিদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তা অবশ্য ঠিক। ভাবি মারা যাওয়ার আগে আমি তাকে তো দেড়-দুই মাস কাছ থেকে দেখেছি। আমার কাছে কিন্তু কখনো মনেই হয়নি ভাবির মানসিক কোনো সমস্যা আছে। বরং মনে হয়েছে, তিনি খুব চুপচাপ ধরনের অমায়িক একজন মহিলা।

হেদায়েত হোসেন একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার ভাবির এমনিতে কোনো সমস্যা ছিল না। হঠাৎ হঠাৎ মানসিক ভারসাম্য রাখতে পারত না। তাও আবার বছরে এক-দুই মাস। এ জন্য তাওরাঙ্গার কিছু ফ্যামিলি দায়ী। তারা জানত, লাকির সামান্য মানসিক সমস্যা আছে। কিন্তু তারপরও তাকে মানসিক চাপ দিত। উল্টাপাল্টা কথা বলত।

- কী উল্টাপাল্টা কথা বলত?

- কত কী উল্টাপাল্টা কথা! এই ধর কোনো ফিমেল ওয়ার্কার অরচার্ডে আমার অধীনে কাজ করছে। কত ধরনের ফিমেল ওয়ার্কারই থাকে। ইস্ট ইউরোপ, সাউথ আমেরিকা বা কোনো প্যাসিফিক আইল্যান্ডের। আমি সেই ফিমেল ওয়ার্কারের সঙ্গে কোনো কারণে অরচার্ডে কথা বললাম। ব্যস, ওটা তোমার ভাবির কানে চলে আসবে। কী কথা আসবে ওটা আমি জানতে পারি না। কিন্তু ততক্ষণে তোমার ভাবির মাথাটা খারাপ করে দিবে।

- এটা তো খুব অন্যায় কথা!

- শুধু কী অন্যায়, মহা অন্যায়। আসলে আমাদের এই বিদেশে বাঙালি সমাজটা খুব খারাপ। এখানকার বাঙালিরা সব উচ্চশিক্ষিত তো। উচ্চশিক্ষিতরা খারাপ হলে যা হয়।

জাহিদ বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন।

হেদায়েত হোসেন মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, আচ্ছা, বাদ দাও ওসব কথা। তোমাকে যে কথা বলার জন্য এ সময় এসেছি। স্যারকে নিয়ে একটু সমস্যায় পড়ে গেছি।

- কোন স্যার? আমাদের আজমল স্যার?

- হ্যাঁ, আজমল স্যার।

- স্যারের আবার কী হয়েছে?

- স্যারের কিছু হয়নি। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে, ইমিগ্রেশন অফিসার ও পুলিশ মিলে বিভিন্ন অরচার্ডে নিউজিল্যান্ডে অবৈধ নাগরিক ধরার জন্য রেইড দিচ্ছে।

- আমি যতদূর জানি, তারা বিভিন্ন ইনফরমেশনের ওপর নির্ভর করে রেইড দেয়। এমনি এমনি রেইড দিতে গেলে তো তারা সারাজীবনও কাউকে খুঁজে পাবে না। তাওরাঙ্গা ও টিপুকিতে যে বড় বড় অরচার্ড! আর একেকটা অরচার্ডে বারো-চৌদ্দটা করে বণ্ডক।

- তারা তথ্যের ভিত্তিতেই রেইড দেয়। স্যারের তো এখন কোনো কাগজপত্র নেই। তার কাজ করারও কোনো অনুমতি নেই।

- জি, হেদায়েত ভাই। এটা সত্য, স্যার এখন নিউজিল্যান্ডের অবৈধ নাগরিক। ওভার স্টেয়ার। কিন্তু তার ব্যাপারে কে তথ্য দিবে? তাকে তো এখানে কেউ ভালোভাবে চিনে না। অফিস আদালতেও তার এখানকার কোনো ইনফরমেশন নেই। স্যার যে তাওরাঙ্গা আছেন, ওটা হেস্টিংসের সাইদ ভাই, আপনি, আমি আর আপনার কিছু ওয়ার্কার বাদে কেউ তো জানে না।

- আজমল স্যারকে এখানকার কেউ না চিনলেও আমাকে তো সবাই চিনে। আমি স্যারকে কাজ দিয়েছি, ওটাই যথেষ্ট।

- আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

হেদায়েত হোসেন একটু ঝুঁকে চায়ের কাপটা সামনের টি টেবিলের ওপর রেখে বললেন, জাহিদ, স্যার যে অবৈধ, এই ইনফরমেশন স্যারের প্রতি শত্রুতা করে কেউ ইমিগ্রেশনে পাঠাবে না। আমার প্রতি শত্রুতা করে পাঠাবে। এখানে বাঙালি কন্ট্রাক্টররা একজন আরেকজনের কাঁচা মাংস চিবিয়ে খায়। তবে হ্যাঁ, সবাই নয়। আমার মতো নিরীহগোছের কয়েকজন কন্ট্রাক্টর, যেমন- মোজাম্মেল হোসেন, হায়দার আলী, জাকির হোসেন, মোসলেম উদ্দিনের কথা আলাদা। তারা কারও পিছে লাগতে যায় না। নিজেদের ওয়ার্কারদের নিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু তিন জয়নালের কথা কে বলবে?

জাহিদ জিজ্ঞেস করল, তিন জয়নাল?

- হ্যাঁ, তিন জয়নাল। জয়নাল আবেদিন, জয়নাল হোসেন ও ফকরুদ্দিন জয়নাল।

- তাদেরকে তো চিনতে পারলাম না?

- আমি তাদের আরেকটা নাম বললে চিনতে পারবে।

- কী নাম?

- মেরিড জয়নাল, চুলওয়ালা জয়নাল ও পিচ্ছি জয়নাল।

জাহিদ হেসে ফেলল। বলল, আমি তাদের নাম শুনেছি। কিন্তু কখনো কাছ থেকে দেখিনি।

হেদায়েত হোসেন বলল, তাদের সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভালো। তারা পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

- তারা আমার কী করবে?

- তোমার কিছু করতে পারবে না। তুমি নিউজিল্যান্ডের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট। কিন্তু আজমল স্যারের করবে। তিন জয়নাল অনেক বাঙালির ক্ষতি করেছে। ওদের কারণে বাঙালিরা নিউজিল্যান্ডে অবৈধ হয়ে বেশিদিন অরচার্ডে কাজ করতে পারে না। ইমিগ্রেশন অফিসার বা পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যায়। অথচ দেখ, ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবি ওয়ার্কার বা ফিজি ওয়ার্কাররা দশ-বারো বছর অবৈধভাবে বসবাস করেও ধরা পড়ে না। দিব্যি কাজ করে যাচ্ছে।

- এই তিন জয়নাল এ রকম কেন?

- তারা চায়, তারাই শুধু কন্ট্রাক্টরি করবে। অরচার্ডে রাজত্ব করবে। বাঙালিদের মধ্যে ওটাই যেন তাদের রাজত্ব। আমরা যারা নিরীহ কন্ট্রাক্টর, তারা না পারছি তিন জয়নালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে, না পারছি তাদের দমিয়ে রাখতে। আসলে আমরা তো তাদের মতো এত নিচে নামতে পারি না!

- তাদের কি ওয়ার্কার কম?

- কমই। আর বাঙালিরা কেউ তাদের সঙ্গে কাজ করতে চায় না। কারণ তারা অরচার্ডের কাজ নিয়ে মালিকের কাছ থেকে তো কমিশন নেয়ই, ওয়ার্কারদের কাছ থেকেও ভাগ বসায়?

- ভাগ বসায় মানে, কমিশন নেয়?

- হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। কিন্তু আমরা মালিকের কমিশনটা নেই। ওয়ার্কারদের কাছ থেকে কমিশন নেই না। এতেই তাদের গাত্র জ্বালা।

- হেস্টিংসেও আপেল অরচার্ডে বেশ কয়েকজন বাঙালি কন্ট্রাক্টর আছে। ওখানে তো কেউ কারও পিছে এমনভাবে লাগে না? বরং তাদের মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক।

হেদায়েত হোসেন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ওখানে যে তিন জয়নাল নেই! জাহিদ শব্দ করে হেসে ফেলল।

নয়

হেদায়েত হোসেন চারদিন আগেই এক রাতে এসে আজমল হোসেনের কিউই ফলের অরচার্ডে কাজ করা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। আজ সেই আশঙ্কা কেমন সত্য হয়ে গেল...! এখন আজমল হোসেনকে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। এখানে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই।

জাহিদ এই আকস্মিক ঘটনায় কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে হাত-পা ছেড়ে ঘাসের ওপর বসে আছে। এখানটায় এতক্ষণ অরচার্ডের প্রায় সব শ্রমিকেরা একত্রে জড়ো হয়েছিল। আজমল হোসেনের ব্যাপারে তাদের কারও কিছু করার নেই। বাঙালি শ্রমিকেরা জাহিদের পাশে আরও বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে গেছে। এখন সবাই যার যার কাজে অরচার্ডের ভেতর ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একেকটা কিউই ফলের গাছের ডালা কাটলেই আট ডলার। তাদের সারাদিনে অন্তত পঁচিশটা কিউই ফলের গাছের ডালা কাটতে হবে। তারপরই না তাদের দৈনিক দুই শ ডলার ইনকামের টার্গেট পুরণ হবে। মাসের শেষে ছয় হাজার ডলার। বাংলাদেশি টাকায় প্রায় চার লক্ষ টাকা। কেউ কেউ আছে একাই দৈনিক পঁয়ত্রিশ-চল্লিশটা কিউই ফলের গাছের ডালা কেটে ফেলতে পারে। অনেকে আবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে। তাদের তো মাসের শেষে বারো হাজার ডলার ইনকাম। বাংলাদেশি টাকায় আট লক্ষ টাকা...! তাই আজমল হোসেনের জন্য তাদের অযথা সময় নষ্ট করে কী লাভ? তারা যতটুকু দুঃখ প্রকাশ করেছে, ততটুকুই যথেষ্ট। এ ছাড়া আজমল হোসেনের এহেন পরিস্থিতে তো কারও কিছু করার নেই।

কিন্তু জাহিদের তো মন মানছে না। সে ঘাসের ওপর হাতপা ছেড়ে বসে আকাশপাতাল ভাবছে। তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, আজমল হোসেন এ মুহূর্তে বেথেলেহ্যাম অরচার্ডে নেই। গত পাঁচ দিন ধরেই তারা এই অরচার্ডে কাজ করছে। আর দুই দিন কাজ করলেই এই অরচার্ডটা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এরই মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল!

জাহিদ ভেবে পেল না, আজমল স্যার কার এমন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন যে তাকে ইমিগ্রেশন অফিসার ও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলো? তিনি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। বাংলাদেশে একটা কলেজের শিক্ষক ছিলেন। প্রায় সাড়ে ছয়-সাতটা বছর ধরে কী অসহায়ভাবেই না নিউজিল্যান্ডে পড়ে আছেন! মাত্র দুই কী আড়াই মাস হয়েছে তিনি নিউজিল্যান্ডে অবৈধ নাগরিক হয়েছেন। যাকে বলে ওভার স্টেয়ার। কিন্তু এই তাওরাঙ্গা-টিপুকি শহরে অনেকে আট-দশ বছর কিংবা আরও বেশি সময় বসবাস করেও তো ইমিগ্রেশন-পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে না। মাত্র আড়াই মাসে তিনি ধরা পড়ে গেলেন?

ঘণ্টাখানেক আগের দৃশ্যটা জাহিদের মনে এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ করেই তিনজন পুলিশ অফিসার ও দুই জন ইমিগ্রেশন অফিসার বেথেলেহ্যাম অরচার্ডে এসে হাজির হন। তারা সরাসরি আজমল হোসেনের কাছে গিয়ে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। ততক্ষণে জাহিদ সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিছুক্ষণ পর আরও কিছু শ্রমিক এসে সেখানে হাজির হয়। এরই মধ্যে এক পুলিশ অফিসার ভদ্র ভাষায় আজমল হোসেনকে তাদের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠতে বলেন। আজমল হোসেন বিমর্ষভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে অনুসরণ করে তাদের একটা গাড়িতে গিয়ে বসে। তারা মোট দুটো গাড়ি নিয়ে এসেছিল। একটা পিকআপ ভ্যান। একটা সিডান। গাড়ি দুটো আজমল হোসেনকে নিয়ে ধীর গতিতে বেথেলেহ্যাম অরচার্ড ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে মাত্র আধা ঘণ্টা সময়ের মধ্যে।

জাহিদ নিশ্চিত, ইমিগ্রেশন ও পুলিশ অফিসাররা আজমল হোসেনের সব তথ্য পাই পাই করে যাচাই করেই বেথেলেহ্যাম অরচার্ডে এসেছিল। নয়তো তারা কেন আর কাউকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করেনি? যদিও আজমল হোসেন বাদে এই অরচার্ডে আর কেউ নিউজিল্যান্ডের অবৈধ নাগরিক নয়।

জাহিদ সাধারণত কুসংস্কার বিশ্বাস করে না। কিন্তু আজ সকালে ড্রাইভওয়ে থেকে বের হওয়ার সময় একটা কালো বিড়াল তার গাড়ির চাকার নিচে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল। আজমল হোসেন বেথেলেহ্যাম অরচার্ডে এসেই ঘাসের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়েন। জাহিদের আজ দুপুরের আগে কিউই ফলের ডালায় লেগে আঙুল কেটে যায়।

জাহিদ ভাবল, কিউই ফলের গাছের ডালায় লেগে একটা আঙুল কাটতেই পারে। কিউই ফলের গাছের ডালগুলো পুরোনো ক্লিপ দিয়ে আটকানো। ড্রাইভওয়ে ধরে কালো বিড়াল যেতেই পারে। নিউজিল্যান্ডের মানুষ কালো-সাদা রং মাথায় নিয়ে বিড়াল পোষে না। আর আজমল স্যার কিউই ফলের বাগানে ঘাসের ওপর হোঁচট খেতেই পারেন। এখানে প্রায় প্রত্যেকটা অরচার্ডে খরগোশেরা গর্ত করে। কিন্তু তারপরও জাহিদের মনে ব্যাপারগুলো খচখচ করছে। আজমল হোসেন আজ এখানে ইমিগ্রেশন অফিসার ও পুলিশ অফিসারদের কাছে ধরা না পড়লে হয়তো সে এসব কিছু মাথায়ই আনত না।

জাহিদ এখন ঘাসের ওপর হাত-পা ছেড়ে বসে হেদায়েত হোসেনের অপেক্ষা করছে। হেদায়েত হোসেন দূরের একটা গ্রিনভ্যালি অরচার্ডে আছেন। ওখান থেকে আসতে কমপক্ষে চল্লিশ মিনিট লাগবে। এরই মধ্যে অবশ্য এক ঘণ্টা চলে গেছে। কিন্তু হেদায়েত হোসেন এখনো আসেননি। জাহিদ হেদায়েত হোসেনকে ফোন দিতে গিয়ে কী ভেবে ফোন দিল না। ভাবল, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। তারপর না হয় ফোন দিবে।

জাহিদ দৃষ্টির ওঠানামা করে একবার আকাশ দেখল, একবার সবুজ প্রান্তরের দিকে তাকাল। তারা আজ জি-বণ্ডকে কাজ করছে। বেথেলেহ্যাম অরচার্ডটা পাহাড়ের উঁচুনিচুতে বলে অরচার্ডের জি-ব্লক থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বেশ দূরে দূরে কৃষকদের বাংলো। কৃষকদের বাংলোর চিমনি দিয়ে এখনই ধোঁয়া উঠছে। এখনো পুরোপুরি বিকেল হয়ে আসেনি। দুপুর-বিকেলের সন্ধিক্ষণ বলা যায়।

জাহিদ ঘড়ি দেখল। সবে বিকেল তিনটা বাজে। সাধারণত তারা পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে।

ঘাসের ওপর বসে থাকতে থাকতে জাহিদের একধরনের নিস্তব্ধতা পেয়ে বসল। আজ দিনটা বেশ পরিষ্কার। চারদিকে কাঁচা সোনা গলা রোদ পড়েছে। পাহাড়ের ঢালে রোদটা যেন সবুজ ঘাসের ওপর নরম বিছানা পেতে রেখেছে। বসন্ত আসি আসি করে আসছে না। শীতটাও কেমন যাচ্ছে না। বরং রাতে শীতটা আরও জেঁকে পড়ছে।

জাহিদের একটা সিগারেট টানতে ইচ্ছে হলো। প্যান্টের পকেটেই সিগারেটের প্যাকেটটা। লাইটারটাও সঙ্গে আছে। জাহিদ উঠে দাঁড়াল। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটারটা বের করল। সিগারটের প্যাকেট থেকে একটা শলা বের করল ঠিকই, কিন্তু সে ধরাল না। সে গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। সে আপাতত এখানে না বসে থেকে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা টানবে। গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট টানার অভ্যাসটা তার দীর্ঘদিনের। এটা তার ভালোও লাগে।

গাড়িটা শেডের পাশে। জি-ব্লক থেকে শ্যাডটা বেশি দূরে নয়। জাহিদ সেদিকে হাঁটতে শুরু করল। সবুজ ঘাস মাড়িয়ে সে ধীর পায়ে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। হেদায়েত হোসেন এলে এখানেই প্রথম আসবেন। সবার গাড়িগুলো এখানেই পার্ক করা।

জাহিদ গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেটটা ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে আবার আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে নীলের ওপর ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। তবে মেঘগুলো সূর্যের মুখে থেকে বেশ দূরে দূরে। শেডের এখান থেকে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রান্তরটা দেখা যায় না।

জাহিদ ভাবল, হেদায়েত ভাই এত দেরি করছেন কেন? তিনি কি ইচ্ছে করেই দেরি করছেন? তিনি ইচ্ছে করে দেরি করতেও পারেন। একে তো আজমল স্যারের নিউজিল্যান্ডে বসবাস করা ও কাজ করার বৈধ অনুমতি নেই। এটা জেনেও হেদায়েত ভাই আজমল স্যারকে কাজ দিয়েছেন। এখন তাকে হয়তো বেশ ঝামেলা পোহাতে হবে। ইনকাম ট্যাক্স অফিস ও ইমিগ্রেশন তাকে নিয়ে টানাটানি করতে পারে।

জাহিদ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবার দিঘল অরচার্ডের দিকে তাকাল। তার সামনে এফ-ব্লক। এর পরই জি-ব্লক। এমনিতেই সে কিউই ফলের বাগানের ওইন্টার প্রুনিংয়ের কাজটা ভালো লাগে না। এখন

স্যারের এই ঘটনার পর বাগানের প্রতিটা গাছ যেন কেমন হা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

জাহিদ কিউই ফলের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কেমন উদাস হয়ে গেল। বিকেলের এক ফালি রোদ তার চেহারায় এসে পড়েছে। তার হঠাৎ সাইদ আহমেদের কথা মনে পড়ল। ভাবল, এই সাইদ ভাইই তো দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর আজমল স্যারকে বিভিন্নভাবে কাজ দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। তাকে তো একটা ফোন দিয়ে আজমল স্যারের বিষয়টা জানানোর দরকার।

জাহিদ ভাবতে ভাবতেই প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল। আর ঠিক তখন সে হেদায়েত হোসেনের গাড়িটা দেখতে পেল। গাড়িটা গেট পেরিয়ে শেডের দিকেই আসছে।

জাহিদ সাইদ আহমেদকে ফোন না দিয়ে মোবাইলটা আবার পকেটে রেখে দিল।

হেদায়েত হোসেন শেডের কাছে গাড়িটা পার্ক করে নেমে বললেন, সরি জাহিদ, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ঝামেলার ওপর ঝামেলা। মালয়েশিয়ান ও চাইনিজ ওয়ার্কারদের নিয়ে ওমাহোর অরচার্ডে যে কাজ করাচ্ছি, তাদের কাজে নাকি মালিক খুব একটা হ্যাপি না। তাদের কাজ থামিয়ে দিয়েছে। আমাকে সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা সামলে আসতে হয়েছে।

জাহিদ মাথা ঝাঁকাল। কিছু বলল না।

হেদায়েত হোসেন বললেন, এবার আজমল স্যারের ব্যাপারটা কী হয়েছিল, তা প্রথম থেকে বলো।

জাহিদ সিগারেটটা শেষ করে ফিলটারটা একটু দূরে ফেলে বলল, ওই তো, আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে জি-ব্লকের ভেতর যার যার লাইনে কাজ করছি। আজমল স্যার আমার পাশের লাইনেই ছিলেন। হঠাৎ দেখে, ঠিক জি-ব্লকের সামনে দুটো গাড়ি এসে থামল। একটা মিনি ভ্যান, একটা সাধারণ সিডান। মিনি ভ্যানটা ছিল পুলিশের গাড়ি। তবে আমি তখন বুঝতে পারিনি যে ওটা পুলিশের পিকআপ ভ্যান। পুলিশের কোনো সাইন ছিল না। একেবারে সাদামাটা ভ্যান গাড়ি। ভেবেছিলাম, মালিক পক্ষের কেউ কাজ দেখতে এসেছে। আর সাধারণ সিডানটায় এসেছিল দুজন ইমিগ্রেশন অফিসার। তারা সরাসরি স্যারের কাছে চলে আসে। স্যারকে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমি ঠিক তখনই সেখানে গিয়ে হাজির হই।

হেদায়েত হোসেন নিজে নিজে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ।

জাহিদ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যাপারটা, হেদায়েত ভাই?

- স্যারের ব্যাপারটা।
- স্যারের কোন ব্যাপারটা?
- তারা জানল কীভাবে যে আজমল স্যার বেহেলেহ্যাম অরচার্ডের জি-ব্লকে কাজ করছেন?
- আমি ঠিক জানি না।
- তারা কি সরাসরি আজমল স্যারের লাইনেই গিয়েছিল, নাকি আর কারও লাইনে গিয়েছিল?
- না, সরাসরি আজমল স্যারের লাইনেই গিয়েছিল।
- আমি যা সন্দেহ করেছিলাম।
- কী সন্দেহ?
- আচ্ছা, আমি সেটা পরে বলছি। তুমি আমার আরেকটা কথার জবাব দাও। আজমল স্যারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার বা পুলিশ কি আর কারও সঙ্গে কথা বলেছে?
- না, আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি।
- তারা আর কাউকে তাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস জিজ্ঞেস করেছে?
- না, কাউকে জিজ্ঞেস করেনি। এমনকি আমাকেও না।
- এর মানে, তারা আজমল স্যারের ব্যাপারে স্পেসিফিক ইনফরমেশন নিয়ে এসেছে। স্যার এই অরচার্ডের কোন বণ্ডকে ও কোন লাইনে কাজ করে, ওটাও তারা স্পষ্টভাবে জেনে এসেছে।

জাহিদ এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, হেদায়েত ভাই, ওটা তো আমার মাথায় আসেনি? ওটা কীভাবে সম্ভব হলো। তাদের কাছে এত নিখুঁত ইনফরমেশন গেল কোথায় থেকে?

হেদায়েত হোসেন বললেন, আমি ঠিক জানি না। হয়তো তাদের ইনফরমার আগে থেকেই লুকিয়ে আজমল স্যারের ওপর নজর রাখছিল।

আর নয়তো এই অরচার্ডের আমার কোনো ওয়ার্কার তিন জয়নালের কোনো এক জয়নালের কাছে আজমল স্যারের ব্যাপারে ইনফরমেশান দিয়েছিল। তোমাকে তিন-চারদিন আগে এক রাতে তিন জয়নালের কথা বলেছি না? তারা খুব খারাপ। নিজের দশ হাজার ডলার নষ্ট করে হলেও অন্যের ক্ষতি করবে? মরলে তাদের নিশ্চিত সরাসরি হাবিয়া দোজখে যাবে। তারা শয়তানের চেয়েও বড় শয়তান।

জাহিদ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, তার মানে, এই জি-ব্লকে যে কয়জন বাঙালি কাজ করে, তাদের কেউ...?

- বাঙালি নাও হতে পারে।

- তাহলে কারা?

- এখানে তো বাঙালি বাদেও সামোয়া-কুক আইল্যান্ডের ওয়ার্কাররা কাজ করছে। তাদের কেউ হতে পারে। আবার বাঙালিও হতে পারে।

- সেটা যে-ই হোক, একটা অমানবিক কাজ করেছে। ব্যাপারটা যে স্যারের জন্য কী মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে...!

হেদায়েত হোসেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ব্যাপারটা সত্যি অমানবিক ও আজমল স্যারের জন্য মর্মান্তিক।

জাহিদও একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জিজ্ঞেস করল, এখন স্যারের জন্য কী করা যায়, বলেন তো?

হেদায়েত হোসেন বললেন, এখন আজমল স্যারের জন্য কিছুই করার নেই। স্যারকে ডিপোর্ট করা এখন জাস্ট সময়ের ব্যাপার। কিন্তু আমি এখন কীভাবে যে এই সমস্যা থেকে বেঁচে যেতে পারি?

- জি, হেদায়েত ভাই, আপনি নিজেও স্যারের জন্য সমস্যায় পড়ে গেলেন।

- এই সমস্যা থেকে শুধু তুমি আমাকে বাঁচাতে পার।

- সেটা কীভাবে?

- আমার বাসায়, মানে তোমাদের স্লিপ আউটে পুলিশ সার্চ করতে আসবে। আজমল স্যারের কী অ্যাসেট আছে জানতে আসবে। তখন তোমাকে অনেক প্রশ্ন করতে পারে। তুমি শুধু একটা কথা বলবে, আজমল স্যার এ বাসায় তোমার সঙ্গে মাত্র এক সপ্তাহ ধরে থাকেন।

- সেটা কেমনে সম্ভব?

- সম্ভব না কেন?

- স্যার তো এর আগে হেস্টিংস শহরে আমার সঙ্গে সাড়ে পাঁচ বছর থেকে এসেছেন। তাদের কাছে সব রেকর্ড আছে।

- তা বুঝতে পারছি। হেস্টিংসের ব্যাপারটা এখানে না টেনে আনলেও হবে। আজমল স্যার যখন হেস্টিংসে ছিলেন তখন তিনি নিউজিল্যান্ডের টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে হলেও লিগ্যাল ছিলেন। তুমি শুধু এখানকার কথা বলবে। তুমি বলবে, মাঝখানে এত দিন আজমল কোথায় ছিলেন, তুমি সেটা জানো না। গত সপ্তাহে হঠাৎ করেই তোমার বাসায় এসে উঠেছেন।

- আমি তো এ বাসায় প্রায় আড়াই মাস ধরে থাকছি।

- এ বাসায় তোমার থাকার সঙ্গে স্যারের থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। স্লিপ আউটটায় থাকার জন্য যে রেন্টাল এগ্রিমেন্ট হয়েছে, সেটা তোমার সঙ্গে হয়েছে। আজমল স্যারের সঙ্গে নয়।

জাহিদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আচ্ছা, সেটা না হয় বললাম। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে আমি বলব, স্যার গত সপ্তাহে হঠাৎ করে বাসায় এসে উঠেছেন। কিন্তু এতে আপনার লাভ হবে কী?

হেদায়েত হোসেন বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন, এতে আমার অনেক লাভ হবে। পুলিশ আমাকেও আজমল স্যারের ব্যাপারে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কারণ আমি আজমল স্যারকে কাজ দিয়েছি। আজমল স্যার নিউজিল্যান্ডে ইলিগ্যালভাবে বসবাস করছেন। ওয়ার্ক পারমিট নেই। তাকে আমার কাজ দেওয়াটাও ইলিগ্যাল। মানে অবৈধ।

- আমি সেটা জানি।

- হ্যাঁ, এখন কথা হলো, আমি পুলিশকে বলব, আজমল স্যার হঠাৎ করেই এ সপ্তাহের প্রথমে আমার সঙ্গে কাজ করা শুরু করেছেন। আমি জানতাম না যে আজমল স্যার ইলিগ্যাল। তার বৈধভাবে কাজ করার কোনো অনুমতি নেই। তিনি ওভার স্টেয়ার।

- আপনি সেটা না হয় বললেন। তারপর?

- এতে আমি স্যারের ব্যাপারটায় পার পেয়ে যাব।

- কীভাবে? পুলিশ জিজ্ঞেস করবে না, আপনি আজমল স্যারের কাগজপত্র না দেখে কেন কাজ দিলেন?

- সেটা জিজ্ঞেস করলে বলব, আজমল স্যার দেব-দিচ্ছি করে দিচ্ছিলেন না। আর এখানে তো সব অফিশিয়াল কাজ কমপক্ষে দুই সপ্তাহের সময় নেয়। মিনিমাম টেন ওয়ার্কিং ডেজ। এ জন্যই তো তোমাকে বলছি। পুলিশ তোমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবে, আজমল স্যার এক সপ্তাহ হয় এখানে এসেছেন। আর আমি বলব, এ সপ্তাহের শুরুতে তাকে আমার অধীনে কাজ দিয়েছি।

- আচ্ছা, হেদায়েত ভাই। আমি পুলিশকে তাই বলব। ডোন্ট ওরি।

- থ্যাংক ইউ জাহিদ। একটা কথা বলি, আমি তো আজমল স্যারকে কাজ দিয়ে কোনো অন্যায় করিনি। বরং সবকিছু জেনে রিক্স নিয়ে কাজ দিয়েছিলাম। প্লিজ, কোঅপারেট মি। এমনিতেই আমারওপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে। তোমার ভাবি মারা গেল কিছুদিন আগে। এখন আজমল স্যারকে নিয়ে নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে গেলাম। এখন লইয়ার ফি ও অ্যাকাউন্টেন্ট ফি যে কত টাকা যায়?

জাহিদ জিজ্ঞেস করল, হেদায়েত ভাই, আপনার লইয়ার ফি ও অ্যাকাউন্টেন্ট ফি লাগবে কেন?

হেদায়েত হোসেন বললেন, তুমি তো কনট্রাকটরি করো না, সেটা তুমি বুঝবে না।

দশ

অরচার্ড থেকে ফেরার সময় গাড়ির পাশের সিটের দিকে তাকিয়ে জাহিদের মনটা খারাপ হয়ে গেল। আজ আজমল হোসেন তার পাশের সিটে নেই। জাহিদের মনটা বেথেলেহ্যাম অরচার্ডে থাকতেই খারাপ হয়েছে। হেদায়েত হোসেনের শেষের কথাগুলো তার মোটেও ভালো লাগেনি। অন্য সময় হলে হয়তো সে মেজাজও খারাপ করত। কিন্তু আজ তার মেজাজ খারাপ করার মতো ধৈর্য নেই।

জাহিদ হেদায়েত হোসেনের শেষ কথাগুলো নিয়ে ভাবতে বসল। একজন মানুষ অসহায় হলে অন্য আরেকজনের মানবিকতা এত নিচে নেমে যায় কীভাবে?

এদিকে বিকেলটা প্রায় পড়ে এসেছে। জাহিদ ঘড়ি দেখল। পাঁচটা বাজে। সাধারণত সে কিউই ফলের বাগান থেকে পাঁচটার সময়ই কাজ ছেড়ে বাসায় ফিরে। আজ অবশ্য এতক্ষণ কাজ করেনি। আজমল হোসেনকে পুলিশ ও ইমিগ্রেশন অফিসার ধরে নিয়ে যাওয়ার পর সেই যে কাজ ছেড়েছে, এতক্ষণ শুধু শুধুই কিউই ফলের অরচার্ডে সময় নষ্ট করেছে। সে আরও সময় নষ্ট করেছে হেদায়েত হোসেনের জন্য।

পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের তির্যক রশ্মিটা সরাসরি চোখে এসে লাগছে। জাহিদ যথাসম্ভব সূর্যের আলো থেকে তার দৃষ্টিটা আড়াল করে গাড়ি চালাচ্ছে। সে আপাতত বাসায় যাবে। বাসায় গিয়ে গোছল করে কাপড়চোপড় পরে তাওরাঙ্গা পুলিশ স্টেশানে যাবে। জাহিদ জানে, আজমল হোসেনের জন্য তার কিছুই করার নেই। কিন্তু তারপরও তার মন তো মানছে না। যদি অলৌকিক কিছু ঘটে! তাওরাঙ্গা পুলিশ স্টেশানে যাওয়ার পর কোনো পুলিশ অফিসার যদি বলেন, তুমি আজমল হোসেনকে বাসায় নিয়ে যেতে পার। আজমল হোসেন নির্দোষ...!

জাহিদ জানে, আজ এমন কিছুই ঘটবে না। নিউজিল্যান্ডে এসব আইনের প্রক্রিয়ায় অলৌকিক বলে কোনো শব্দ নেই। আজমল হোসেনকে আইন মেনেই বাংলাদেশ চলে যেতে হবে।

মোবাইলটা বেজে উঠল। জাহিদ দেখল, হেদায়েত হোসেনের ফোন। হেদায়েত হোসেনের ফোন দেখে তার মনটা কেন জানি আবার খারাপ হয়ে গেল। মানুষ নিজের স্বার্থটা এত ভাবতে পারে?

জাহিদ রাস্তার এক পাশে গাড়ি থামিয়ে ফোন ধরল। তার গাড়িটা পুরোনো বলে গাড়িতে ইনবিল্ড বণ্ডু-টুথ নেই। সে একটা ব্লু-টুথ ডিভাইস মাঝেমধ্যে কানের ওপর ঝুলিয়ে রাখে। আজ সেটা সে নিয়ে আসেনি।

জাহিদ বলল, জি, হেদায়েত ভাই। বলেন।

হেদায়েত হোসেন বললেন, তুমি কি বাসায় চলে গেছ?

জাহিদ বলল, না, এখনো রাস্তায়।

- এত দেরি?

- আপনি বেথেলেহ্যাম অরচার্ড থেকে চলে যাওয়ার পর আমি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

- কেন? আর কোনো সমস্যা হয়েছিল নাকি?

- না না, আর কী সমস্যা হবে?
- তাহলে দাঁড়িয়েছিলে কেন? আবার কাজ শুরু করেছিলে?
- না, আসলে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল তো, তাই গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।
- পরে অরচার্ডের আর কারও সঙ্গে কথা হয়েছে?
- না। তারা কাজ শেষ করার আগেই আমি অরচার্ড থেকে বের হয়ে গেছি। এখন বাসার কাছাকাছি আছি।
- ও আচ্ছা। বলেই হেদায়েত হোসেন একটু থামলেন। তারপর বললেন, শোনো জাহিদ, একটা জরুরি কথা বলার জন্য ফোন দিয়েছি।
জাহিদ জিজ্ঞেস করল, কী জরুরি কথা?
- আজমল স্যার টাকাপয়সা কী ব্যাংকে রাখতেন নাকি বাসায় রাখতেন?
- হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন হেদায়েত ভাই?
- প্রশ্নটা এ কারণে করছি, বাসায় আজমল স্যারের কী কী অ্যাসেট আছে, তা দেখতে পুলিশ আসতে পারে।
- পুলিশ না হয় আসল। আমি কী করব?
- না মানে, আজমল স্যারের টাকাপয়সা যদি ব্যাংকে থাকে, সেটা অন্য কথা। পুলিশ এমনিতেই স্যারের ব্যাংক একাউন্ট সিজ করবে। আর বাসায় টাকাপয়সা থাকলে পুলিশ সেই টাকাপয়সার খবর জানবে না। তুমি ইচ্ছে করলে স্যারের টাকাপয়সাগুলো আমার কাছে রাখতে পার। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই বাসায় পৌঁছে যাব।
অন্য সময় হলে জাহিদ হেদায়েত হোসেনের কথাগুলো সহজেই মেনে নিত। এমনকি আজ দুপুরেও যদি হেদায়েত হোসেন এই কথাগুলো বলতেন, জাহিদ বিনাবাক্যে মেনে নিয়ে বলত, আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু কতক্ষণ আগে বেথেলেহ্যাম অরচার্ডে হেদায়েত হোসেনের শেষ কথাগুলো জাহিদকে বেশ পীড়া দিয়েছে। মানুষের চেহারা মুহূর্তে এমনে বদলে যায়? জাহিদ বলল, হেদায়েত ভাই, বাসায় স্যারের তেমন কোনো টাকাপয়সা নেই।
হেদায়েত হোসেন বললেন, ও, আচ্ছা। আমি এখন তাহলে টেলিফোন রাখি।
জাহিদ হ্যাঁ বা না কিছু বলল না।
হেদায়েত হোসেন ওপাশে ফোনের লাইন কেটে দিলেন।
জাহিদ কানের কাছ থেকে মোবাইলটা নামিয়ে দিঘল রাস্তার দিকে তাকাল। রাস্তায় বেশ গাড়ি আসাযাওয়া করছে। কেউ অফিস ফেরত, কেউ অরচার্ড থেকে কাজ করে ফিরছে। জাহিদের একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হলো। তার মাথার ভেতর হেদায়েত হোসেনের ব্যাপারটা নিয়ে একটা জট পাকিয়ে আছে। কিছুতেই সে জটটা খুলতে পারছে না। কিছুক্ষণ ধরে সে একটা বিষয় ভাবছে, আচ্ছা, আজমল স্যারের আজকের এই ইমিগ্রেশন ও পুলিশের ব্যাপারটায় হেদায়েত ভাইয়ের হাত ছিল না তো? চারদিন আগেই তো তিনি রাতে এসে ইনিয়ে-বিনিয়ে আজমল স্যারকে নিয়ে অনেক আলাপ করেছেন। হঠাৎ করে তিন জয়নালের প্রসঙ্গ টেনেছেন। তিন জয়নাল কি তাহলে একটা বাহানা ছিল মাত্র?
জাহিদ ভাবতে ভাবতেই গাড়ি থেকে নামল। মোবাইলটা প্যান্টের এক পকেটে রেখে আরেক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটারটা বের করে একটা সিগারেট ধরাল। তার হঠাৎ মনে হলো, সাইদ আহমেদের সঙ্গে তার কথা বলা প্রয়োজন। তিনিই তো আজমল স্যার ও তাকে কিউই ফলের অরচার্ডে কাজ করার জন্য হেদায়েত হোসেনের কাছে পাঠিয়েছিলেন।
জাহিদ সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে পকেট থেকে আবার মোবাইলটা বের করে সাইদ আহমেদকে ফোন দিল। তিনবার রিং বাজতেই সাইদ আহমেদ ফোন ধরলেন।
ফোন ধরেই সাইদ আহমেদ বললেন, কী ব্যাপার জাহিদ, এত দিন পর আমার কথা মনে পড়ল?
জাহিদ বলল, সাইদ ভাই, এত দিন পর মনে পড়েনি। আপনার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। কিন্তু সারাদিন কিউই ফ্রুটের অরচার্ডে কাজ করে রাতে আর কাউকে ফোন দিতে ইচ্ছে করে না।
- কাজটা খুব কঠিন, তাই না?
- জি, সাইদ ভাই। অনেক কঠিন। কিন্তু এখানকার অনেক বাঙালি দশ-পনেরো বছর ধরে এই কাজটা করছে। তারা কীভাবে যে করে!
- করতে করতে অভ্যাস হয়ে যাবে।
- আমি এই কাজটা বেশি দিন করব না। এটাই লাস্ট সিজন। হ্যামিল্টন অথবা অকল্যান্ডে চলে যাব।
- ওখানে গিয়ে কী করবে?
- ওই তো, লেখাপড়ায় ঢুকব। কোনো একটা কোর্স করে জবে ঢুকব।
- আইডিয়াটা ভালো। তুমি অকল্যান্ড বা হ্যামিল্টন চলে গেলে আজমল স্যারের কী হবে?
জাহিদ এক মুহূর্ত থেমে কী ভেবে ভারী গলায় বলল, সাইদ ভাই, আমি এ জন্যই আপনাকে এখন ফোন দিয়েছি। স্যারকে আজ ইমিগ্রেশন অফিসার আর পুলিশ এসে কিউই ফ্রুটের অরচার্ড থেকে ধরে নিয়ে গেছে।
সাইদ আহমেদ ফোনের ওপাশে আঁতকে উঠলেন। বললেন, কী! কী যা-তা বলছ?
- আমি ঠিকই বলছি, সাইদ ভাই।
- কখন? কীভাবে?
- দুপুরের পর হঠাৎ করেই দুজন ইমিগ্রেশন অফিসার ও তিনজন পুলিশ কিউই ফ্রুটের অরচার্ডে এসে হাজির। স্যারকে ধরে নিয়ে যায়।
- তোমাদের অরচার্ডের আর কাউকে ধরেছে?
- না, স্যার বাদে আর কেউ এই অরচার্ডে অবৈধভাবে কাজ করছে না।
- তাহলে কী তারা স্যারের খবর নিয়ে এসেছিল?
- আমার মনে হয় তাই।
- স্যারের এই খবরটা ইমিগ্রেশনে কে জানাল?
- আমি জানি না। আশ্চর্য ব্যাপার কী, ইমিগ্রেশনে অফিসার আর পুলিশ অরচার্ডের আর কাউকে একটা প্রশ্নও করেনি। অরচার্ডে আমরা প্রায় বিশজন কাজ করছিলাম।
- স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ।
- ব্যাপার আসলেই স্ট্রেঞ্জ। তারা এত মানুষের মধ্যে কিউই ফ্রুট অরচার্ডে শুধুমাত্র স্যারের লাইনটা চিনল কীভাবে? নিশ্চয়ই কেউ তখন বলে দিয়েছিল?
- আমারও তাই মনে হয়। সেখানে তাদের কোনো ইনফরমার ছিল।
- সাইদ ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?
- হ্যাঁ, জিজ্ঞেস কর। কী কথা?
- আপনি হেদায়েত ভাইকে কতদিন ধরে চেনেন?
- চিনি তো অনেক দিন ধরেই। নিউজিল্যান্ডে আসার পরপর এক সঙ্গে কাজ করেছিলাম। তবে খুব বেশি দিন নয়। আমি পরে হেস্টিংসে চলে আসি। সে তাওরাঙ্গাতেই থেকে যায়।
- কিছুদিন আগে যে হেদায়েত ভাইয়ের ওয়াইফ মারা গেছে, ওটা জানেন?
- হ্যাঁ, জানি তো। হেদায়েতের ওয়াইফ মারা যাবার পর না তোমার সঙ্গে কথা হলো? হেদায়েতের সঙ্গেও পরে কথা হয়েছে। তার ওয়াইফ সুইসাইড করেছিল, তাই না?
- জি, সুইসাইড করেছিলেন।
সাইদ আহমেদ জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ হেদায়েতকে নিয়ে এত কথা বলছ কেন? তোমার কী ধারণা সে আজমল স্যারকে ধরিয়ে দিয়েছে?
জাহিদ বলল, আমি ঠিক জানি। আমার কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে।
- আজমল স্যারকে ধরিয়ে দিয়ে তার লাভ কী?
- ওটাও আমি জানি না।
- শোনো, হেদায়েত সম্বন্ধে আমার খুব একটা ধারণা নেই। একটা সময় এক সঙ্গে কাজ করতাম, সেটা প্রায় এক যুগ আগে। তারপর অনেক দিন ধরে দেখাসাক্ষাৎ নেই। হেদায়েত সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা হওয়ার কারণটা কী খুলে বলবে?
- জি বলছি। গত চারদিন আগে হেদায়েত ভাই এক রাতে আজমল স্যার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেছেন। স্যারের অবৈধভাবে কাজ করা নিয়ে অনেক সতর্কবাণী করে গেছেন। চারদিন পরেই স্যার ধরা পড়েন।
- ওটা কাকতালীয় তো হতে পারে।
- তা হতে পারে। কিন্তু আজ?
- হেদায়েত আজ আবার কী করেছে?
- তিনি কিছু করেননি। আজমল স্যার ধরা পড়ার পর স্যারকে একটুও সাহায্য করছেন তো না-ই, বরং স্যারের টাকাগুলো খাওয়ার ধান্ধা করছেন।
- সেটা কেমন?
- হেদায়েত ভাই এখানে কাজের প্রথম দিকের বেতনগুলো দিলেও গত

সাত সপ্তাহ ধরে আজমল স্যারের কোনো বেতন দিচ্ছেন না। অথচ স্যারের গত সাত সপ্তাহে প্রায় আট হাজার ডলার ইনকাম করেছেন। পুরো আট হাজার ডলারই হেদায়েত ভাইয়ের কাছে আটকা।

- আটকা থাকলে এখন স্যার যেহেতু নেই, তুমি নিয়ে নিবে। স্যার বাংলাদেশ যাওয়ার পর টাকাটা পাঠিয়ে দিবে। স্যার তো ওখানে ভালোই কাজ করেছেন।

- জি, স্যার কিউই ফ্রুটের উইন্টার প্রুনিংয়ের কাজটা বেশ ভালোই পারছিলেন। কিন্তু কথা সেটা না। হেদায়েত ভাই এখন বলছেন, স্যারের এই ধরা পড়ার কারণে তার নাকি লইয়ার ধরতে হবে। অ্যাকাউন্টেন্টের সঙ্গে বসতে হবে। এতে নাকি তার অনেক টাকাপয়সা খরচ হবে। তিনি তাই স্যারের টাকাটা দিবেন না। স্যারের আট হাজার ডলার লইয়ার ও অ্যাকাউন্টেন্টের পেছনে খরচ করবেন?

সাইদ আহমেদ ফোনের ওপাশে এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, হেদায়েতের আর পরিবর্তন হলো না। টাকার জন্য এখনো ছ্যাবলামি করে। আচ্ছা জাহিদ, তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কর না। হেদায়েতের কাছ থেকে আজমল স্যারের টাকাটা কীভাবে নিতে হবে সেটা আমি জানি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না, হেদায়েত আজমল স্যারকে ইমিগ্রেশনে ধরিয়ে দেওয়ার মতো এত নিচু কাজ করতে পারবে।

জাহিদ বলল, আমি তাও জানি না। আমার মাথায় কোনোকিছু কাজ করছে না। এখানে আপনিও নেই যে স্যারের এই সমস্যাটা নিয়ে আপনার সাহায্য নেব। হেদায়েত ভাই তো স্যারে এই ব্যাপারটা নিয়ে কাছেই ভিড়তে চাচ্ছেন না। কেমন দূরে দূরে থাকছেন। দূরে থেকে আরও বাড়তি টেনশান দিচ্ছেন।

জাহিদ বাসায় ফিরে এল। বাসায় ঢুকে সে কাজের কাপড়চোপড় ছেড়ে প্রথমেই গোছলটা সেরে নিল। বাথরুম থেকে বের হতেই তার পেটের ক্ষুধাটা কেন জানি বেশ জানান দিয়ে উঠল। কিন্তু তার এ মুহূর্তে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। ফ্রিজে কন্টেইনারে অনেক খাবার আছে। গত রাতেই আজমল হোসেন ও সে মিলে পুরো সপ্তাহের রান্না করে কন্টেইনারে ভরে রেখেছে।

জাহিদ কিছু না খেয়ে আগে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। কিন্তু সে তৈরি হয়েই বাইরে যাওয়ার আগে বেডরুমে গিয়ে ঢুকল। তাদের বেডরুমটা তুলনামূলক ছোট। বেডরুমের দুই পাশে তাদের দুটো বেড। রুমের বামপাশের বেডটা আজমল হোসেনের।

রুমের পশ্চিমে দরজার পাশে জাহিদের বেড হলেও, জাহিদ সাধারণত লাউঞ্জেই ঘুমায়। তাই বেডটা এমনিই পড়ে আছে। জাহিদ আজমল হোসেনের বেডে গিয়ে বসল। বেডের পাশে একটা বড় লাগেজ। আজমল হোসেন বাংলাদেশ থেকে আসার সময় যে লাগেজটা নিয়ে এসেছিলেন, ওটাই।

যেকোনো কারণেই হোক আজমল হোসেনের সেই লাগেজের লকটা খোলা। হয়তো লাগেজে তেমন বিশেষ কিছু নেই বলে তিনি লক করে রাখেননি বা তিনি লক করতে ভুলে গেছেন। আর নয়তো জাহিদকে লাগেজের তালা ভাঙতে হতো।

শেক্সপিয়ারের বাংলা অনুবাদ সমগ্রটা লাগেজটার ওপর। জাহিদ সেই বইটা সরিয়ে বেডে বসেই উপুড় হয়ে লাগেজটা খুলল। লাগেজ খুলে প্রথম শার্টটার ভাঁজেই বেশ অনেকগুলো ডলার পেল। দ্বিতীয় শার্টের ভাঁজেও সে খুচরা আরও কতগুলো ডলার পেল। এ ছাড়া লাগেজের পকেটে বাংলাদেশি পাসপোর্ট। পাসপোর্টে মেয়াদ উত্তীর্ণ নিউজিল্যান্ডের ভিসা। আর কিছু ব্যাংক কার্ড। একটা পুরোনো মোবাইল। কয়েকটা টেলিফোন কার্ড। দুটো জামার বোতাম। একটা পুরোনো ছবির অ্যালবাম। জাহিদ একে একে আজমল হোসেনের সবগুলো শার্ট ও প্যান্টের ভাঁজ খুলে খুলে দেখল। দুটো শার্টের ভাঁজ বাদে অন্য কোনো শার্ট বা প্যান্টের ভাঁজে আর কোনো ডলার বা খুচরা টাকাপয়সা পেল না। সে আজমল হোসেনের শার্ট-প্যান্টগুলো যথাস্থানে রেখে লাগেজের চেইন টেনে দিল। তারপর টান টান হয়ে বসে ডলারগুলো গুনতে শুরু করল। গোনা শেষে দেখল, সব মিলিয়ে মাত্র আট শ সাতান্ন ডলার আছে।

জাহিদ ডলার গুলো নিজের প্যান্টের পকেটে রাখতে রাখতে ভাবল, এখন হেদায়েত হোসেনের কাছ থেকে স্যারের আট হাজার ডলার উদ্ধার করতে পারলেই হয়। প্রয়োজনে সে নিজের কাছ থেকে আরও কিছু ডলার যোগ করে স্যারের জন্য হাজার দশেক ডলার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিবে।

জাহিদ আর দেরি না করে তাওরাঙ্গা পুলিশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। এদিকে বেশ আগেই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাওরাঙ্গা পুলিশ স্টেশানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নেমে এল।

কিন্তু তাওরাঙ্গা পুলিশ স্টেশানে এসে জাহিদ শুনল, আজমল হোসেনকে তাওরাঙ্গা পুলিশ সেশানে নয়, হ্যামিল্টন পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেছে। বে-অব-প্ল্যানটি ও ওয়াইকাটো অঞ্চলের ইমিগ্রেশন অফিস হ্যামিল্টন শহরের। আজমল হোসেনকে এ জন্যই হ্যামিল্টন পুলিশ স্টেশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এগারো

জাহিদ শুনেছে, আজমল হোসেনের এ অবস্থায় শুধুমাত্র স্থানীয় সাংসদ কিছু করতে পারবেন। স্থানীয় সাংসদ যদি ইমিগ্রেশনে একটা ফোন করেন বা একটা চিঠি লিখে দেন, হয়তো আজমল হোসেনের কোনো একটা গতি হতে পারে। কিন্তু এ জন্য স্থানীয় বাঙালি কমিউনিটির বড় ধরনের সমর্থন ও সহযোগিতা লাগবে।

কিন্তু জাহিদ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বেশ কিছু বাঙালির ধারে ধারে ঘুরে কারও কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাবে থাক দূরের কথা আশ্বাসটুকুও পায়নি। অবশ্য সে তাওরাঙ্গা-টিপুকি বা মাউন্ট মাঙ্গানুই শহরের খুব কম বাঙালিকেই চিনে। হেদায়েত হোসেন তো প্রথম থেকেই দূরে দূরে আছেন। আজমল হোসেন ইমিগ্রেশন অফিসার ও পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর কী সব আজব ব্যবহার করছেন। হেস্টিংস থেকে সাইদ আহমেদ যা-ই বলুক, জাহিদের কেন জানি মনে হচ্ছে, আজমল হোসেনের এ ব্যাপারটার পেছনে হেদায়েত হোসেনের হাত আছে।

জাহিদের আজ আধাবেলা কাজ ছিল। বেথেলেহ্যাম কিউই ফলের অরচার্ডের উইন্টার প্রুনিং আজ শেষ হয়ে গেছে। আগামীকাল কোনো কাজ নেই। পরশু থেকে আবার টিপুকির মন্টোগোমেরি অরচার্ডে কাজ শুরু হবে। তাই জাহিদ আজ দুপুরে বাসায় ফিরে গোছল করে হ্যামিল্টনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। সে এখন সরাসরি রাকিবের বাসায় যাবে। ওখানে গিয়ে রাকিবকে সঙ্গে নিয়ে আজমল হোসেনকে দেখতে হ্যামিল্টন পুলিশ স্টেশনে যাবে।

তাওরাঙ্গা শহর থেকে হ্যামিল্টন শহরের দূরত্ব একশ আট কিলোমিটার। গাড়িতে বড়জোর এক ঘণ্টা দশ মিনিট লাগে। আজ শনিবার বলে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা ছিল। জাহিদ এক ঘণ্টার মধ্যেই হ্যামিল্টন পৌঁছে গেল। কেমব্রিজ হয়ে হ্যামিল্টন ইস্টে রাকিবের বাসা খুঁজে পেতে তার মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল। এর আগে সে কখনো রাকিবের বাসায় আসেনি। আজই প্রথম।

জাহিদ ড্রাইভওয়েতে গাড়ি পার্ক করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দরজায় নক করতেই রাকিব দরজা খুলল। রাকিব দরজা খুলেই হাসি মুখে বলল, আস, ভেতরে আস। আমি তোমার অপেক্ষায়ই বসে আছি।

জাহিদ ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তোমার বাসাটা খুব সুন্দর। সামনে-পেছনে এত গাছ! বাসাটা দেখলেই মনে হয়, এখানে একজন কবি বসবাস করে।

রাকিব হাসল। বলল, অনেকেই এই বাসাটার প্রশংসা করে। আমি কিন্তু এত কিছু ভেবে বাসাটা ভাড়া নেইনি। অকল্যান্ড থেকে এসে তাড়াহুড়ার মধ্যে একটা বাসা ভাড়া নেওয়ার দরকার ছিল। এজেন্টের মাধ্যমে এই বাসাটাই পেয়েছিলাম। আমি খুঁজছিলাম এক বেডরুমের বাসা। কিন্তু এই বাসাটা দুই বেডরুমের। তারপরও নিয়েছিলাম।

- এই বাসায় তাহলে দীর্ঘদিন ধরে থাকছ?

- হ্যাঁ, বলতে পার। প্রায় পাঁচ বছর তো হয়ে যাচ্ছে।

- দুই বেডরুমের বাসা। একটা রুম কাউকে ভাড়া দিলেই পারতে?

- ছিল তো। আতিক নামের একজন ছিল। আমার সমবয়সী।

- কোন আতিক?

- তুমি চিনবে কিনা জানি না। সে একসময় তাওরাঙ্গা ছিল।

- আমি চিনি মনে হয়। সে এ দেশি একজনকে বিয়ে করেছিল না? ভ্যাবিয়ান নাম?

- তুমি তো ভালোই চেন।

- সে তার বউকে নিয়ে হেস্টিংসে বেড়াতে গিয়েছিল। সাইদ ভাইয়ের বাসায় উঠেছিল। সেখানেই পরিচয়। সেটা অবশ্য কয়েক বছর আগে। কথাবার্তায় বেশ চালাক-চালাক ভাব।

রাকিব হেসে ফেলল। বলল, তুমি তো মানুষকে বেশ ভালোভাবেই যাচাই করতে পার।
জাহিদ বলল, আমি তোমার মতো কবি না হতে পারি। কিন্তু আমি কষ্ট করে বড় হয়েছি। বারো ঘাটের মানুষ আমি চিনি। আচ্ছা, এখনো কি সে তার বউ ভ্যাবিয়ানের সঙ্গে এখনো সংসার করছে?
- না, ভ্যাবিয়ানের সঙ্গে সংসার ভেঙে গেছে তিন-সাড়ে বছর আগেই। সে এখন আবার নতুন বিয়ে করেছে?
- বাঙালি নিশ্চয়ই?
- হ্যাঁ, বাঙালি। কীভাবে বুঝলে?
- আরে, এটা তো সাধারণ সেন্সের ব্যাপার। সে আগে ভ্যাবিয়ানকে বিয়ে করেছিল নিউজিল্যান্ডের নাগরিকত্বের জন্য। এখন কোনো বাঙালিকে দেশ থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসবে সংসার করার জন্য। সবাই যা করে। শুধু তুমিই এখনো করলে না।
রাকিব আবার হাসল। বলল, আচ্ছা, বাদ দাও ওসব কথা। তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি তোমার জন্য না খেয়ে বসে আছি।
জাহিদ বলল, ও, সরি। আমি তো দুপুরে কাজ থেকে এসে গোছল করে খেয়ে বের হয়েছি।
- কেন খেয়ে এলে? আমি তোমার জন্য রান্না করে রেখেছি।
- কী রান্না করেছ?
- তেমন বিশেষ কিছু না। ভুনা খিচুড়ি রান্না করেছি। গরুর মাংস। আর ডিম ভাজি।
- ওরে বাব্বা! আমার পছন্দের খাবার। হ্যামিল্টন পুলিশ স্টেশান থেকে এসে বিকেলের দিকে বা রাতে ডিনার করব।
রাকিব মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আচ্ছা।
জাহিদ বলল, তুমি খেয়ে নাও।
রাকিব বলল, আমি আরেকজনের জন্য অপেক্ষা করছি। সে এখনই এসে যাবে। সে আসলেই খাব।
জাহিদ জিজ্ঞেস করল, কে সে?
রাকিব আস্তে করে বলল, নদী।
- নদী! মেয়ে?
- নদী তো মেয়েদের নামই হয়।
- বাঙালি?
- হ্যাঁ, বাঙালি।
- এখানকার কোনো বাঙালির মেয়ে?
- না, সে ওয়াইকাটো ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছে।
- কোন সাবজেক্টে?
- মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে।
- ওরে বাব্বা, ও তো কঠিন সাবজেক্ট। মেয়েরা এত কঠিন সাবজেক্ট পড়ে নাকি।
- অনেক মেয়েই পড়ে। বুয়েটে আগে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এখন ছেলে-মেয়ে প্রায় সমান-সমান।
- নদীও কি বুয়েটে পড়েছে?
রাকিব মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ।
জাহিদ হেসে বলল, তুমি আর্টসের ছাত্র হয়ে সাইন্সের ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম। তাও আবার এই বিদেশে। ভালো ভালো। তোমরা কবিরা পারো বটে।
রাকিব জিজ্ঞেস করল, আর্টসের ছাত্র সাইন্সের ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করতে পারবে না, এমন কোনো কথা আছে নাকি?
- তা নেই। আচ্ছা, তোমাদের সম্পর্ক কবে থেকে?
- আমাদের ঘটা করে কোনো সম্পর্ক হয়নি যে সময়টা বলতে পারব।
- সম্পর্ক তো হয়েছে?
- তাও জানি না। আমাদের মধ্যে এ ধরনের কোনো কথা হয়নি।
- তাহলে?
- তাহলে বলে কোনো কথা নেই।
- যারা কবি-সাহিত্যিক, তারা আজব একটা চিজ! রাজ্য ছারখার করে ফেলে, কিন্তু ভেতরের কথা ভেতরে রাখে।
রাকিব হেসে ফেলল। কিছু বলল না।
বাইরে আজ চকচকে রোদ উঠেছে। শীত যাই যাই করছে। বসন্ত এখন ঘরের দুয়ারে। আজকাল বৃষ্টিও কম হচ্ছে। কোনো কোনো রাস্তার দুই পাশে সারি করে লাগানো চেরি গাছগুলোতে ফুল ফুটতে শুরু করেছে।

> তুমি নিশ্চয়ই আমার চিঠি পেয়ে অবাক হবে। অনেক দিন পর তোমাকে চিঠি লিখছি। চিঠি লিখতে বসে আমার নিজের কাছেই অবাক লাগছে। আজকাল তো কেউ কাউকে চিঠি লিখে না। পৃথিবীতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের চিঠি লেখা প্রায় বন্ধ হয়েই গেছে। আজকাল পোস্ট শপ বা পোস্ট অফিসগুলো দাঁড়িয়ে আছে শুধুমাত্র অফিশিয়াল লেটার আর পার্সেল পাঠানোর জন্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নিউজিল্যান্ডের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখনো একজন আরেকজনকে প্রচুর চিঠি লিখেন। সত্যি বলতে কী, চিঠি লেখায় যে ভাব-ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়, অন্য কোনো মাধ্যমে তা মোটেও সম্ভব নয়

মানুষ জাপানকে বলে চেরি ফুলের দেশ। রাকিব কখনো জাপান যায়নি। তবে তার বিশ্বাস, জাপানের আগে নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার হলে মানুষ নিউজিল্যান্ডকেই বলত চেরি ফুলের দেশ। যেমনটা মানুষজন জাপানকে বলে প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ। প্রকৃত অর্থে নিউজিল্যান্ড হলো প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ। নিউজিল্যান্ডের গিজবোর্নে পৃথিবীর সবচেয়ে আগে সূর্যোদয় হয়।
জাহিদও খানিকক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল, কী ভাবছ?
রাকিব বলল, কিছু না। এবার আজমল স্যারে কথা বলো।
- স্যারের কথা কী বলব। স্যারের কথা ভেবে মন খারাপ করতে চাই না।
- সেদিন ফোনে তোমার কাছ থেকে স্যারের কথা শুনে আমারও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সবারই কোনো না কোনোভাবে নিউজিল্যান্ডে একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজমল স্যারেরই কোনো ব্যবস্থা হলো না।
জাহিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হ্যাঁ। তুমিই ঠিকই বলেছ। আসলে দোষটা স্যারের বয়সের ছিল। এ বয়সে কেউ এভাবে বিদেশে আসে?
রাকিব বলল, তিনি এসেছিলেন তো ভালোভাবেই। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হয়ে। মাস্টার্স করবেন বলে এসেছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া না করে এভাবে থেকে যাওয়াটাই বোকামি হয়েছিল।
- স্যার কী করবেন বলো? দেশে স্যারের স্ত্রী ও একটা ছেলে আছে। ওদিকে কলেজের চাকরিটাও চলে গিয়েছিল। আর?
- আর কী?
- স্যার একটু বুদ্ধিমান হলেও হতো। এমন বোকা মানুষ কেউ বিদেশ করে?
- ওটাই প্রধান সমস্যা ছিল। বোকা মানুষের জন্য বিদেশ না। বিদেশ বড় কঠিন স্থান। এখানকার বাস্তবতা আরও কঠিন।
জাহিদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ।